মোগল-পাঠান

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মোগল-পাঠান



রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ় ১৩৫৯

মূল্য আড়াই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
৫·২—১১. ৭. ৫২

ভূমিকা

ইতিহাসের কোন সত্যই নষ্ট না ক'রে আর মন-গড়া ঘটনা ও কথাবার্ত্তার বুকনি না দিয়ে, কেমন ক'রে ইতিহাস-বিখ্যাত লোকদের গল্প মিষ্টি ক'রে লেখা যায়, তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ 'মোগল-পাঠান' নামের এই গল্প-সংগ্রহে দেখিয়েছেন। এই ১৩০ পৃষ্ঠায় পনেরটি সত্য ঘটনার কাহিনী সুন্দর বড় অক্ষরে পরিষ্কার পৃষ্ঠায় ছাপা ; ছয় বছরের বাঙালী ছেলেমেয়েরা এগুলি নিজে নিজেই পড়তে পারবে এবং আনন্দ পাবে। ভাষা এত সরল, কোমল, ঘটনাগুলিও এত মনোরম এবং রচনা-চাতুর্য্য এত পরিপক্ক, যে, পড়তে পড়তে কোথায়ও ক্লান্তি আসে না, বরং পাঠক শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছে ভাবে আরও একটু বেশী কথা শুনতে পেলে ভাল হ'ত।

গল্পগুলির ভিত্তি ভারত-ইতিহাসের পাঠান-মুঘল যুগের হিন্দুস্থান-দক্ষিণ সব জায়গার সত্য-ঘটনা, বাছা বাছা চমকপ্রদ কাহিনী। সেই ক্ষুদ্র বীজ থেকে গাছ গজিয়ে, আবশ্যকমত অতি অল্পমাত্র পল্লবিত ক'রে ব্রজেন্দ্রনাথ আমাদের শিশুদের সামনে এই "জল-খাবার" উপস্থিত করেছেন। আশা করি, দেশের অতীত যুগের বিখ্যাত ব্যক্তিদের এই সব গল্পে মুগ্ধ হয়ে তরুণ পাঠকেরা এ সব কথা মনে রাখবে, এবং বড় হ'লে

ঐ ঐ ব্যক্তিদের সুদীর্ঘ ইতিহাস পড়তে নিজে থেকে ধাবিত হবে,—পরীক্ষার তাড়ায় নয়। হয়ত, কোন কোন ক্ষেত্রে তারা মৌলিক গবেষণা করবার প্রেরণাও পাবে। অন্য দেশের সাহিত্যে এরূপ দৃষ্টান্ত আছে। আশা করি, বঙ্গদেশেও তাই ঘটবে এবং ব্রজেন্দ্রনাথের চেষ্টা এই অপর ক্ষেত্রেও ফলপ্রসূ হবে।

শ্রীযদুনাথ সরকার

সূচী



তোমরা সকলেই বোধ হয় বাবর বাদশার নাম শুনিয়াছ। তিনি আগে ছিলেন কাবুলের একজন সামান্য রাজা। কিন্তু তাঁর মনটা ছিল যেমন দরাজ, আশাও ছিল তেম্‌নি উঁচু। অতটুকু ছোট রাজ্যের রাজা হইয়া তিনি তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাই এই মস্ত বড় সোনার দেশ—ভারতবর্ষের বাদশাগিরির জন্য তাঁর মন ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। রাজা-বাদশা হইবার ইচ্ছা তো অনেকেরই হয়; কিন্তু তেমন বড় হইতে হইলে যে পরিশ্রম, যে সাহস, যে ক্ষমতার দরকার, তাহা কয়টি লোকের থাকে? আমরা ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লাখ টাকার স্বপন দেখি, আর সেই স্বপন ভাঙিয়া গেলে হায়-হায় করিয়া মরি, আর কিছুই করি না। কিন্তু বাবর, আমাদের মত কুড়ের বাদশা ছিলেন না। তাঁর মধ্যে তেজ ছিল, উৎসাহ ছিল, ক্ষমতা ছিল—ফাঁকা কল্পনা লইয়া কি তিনি বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে পারেন? তাই ঢাল-তলোয়ার লইয়া দেশ ছাড়িয়া বীরের মত বুক ফুলাইয়া বাহির হইয়া

পড়িলেন। রণডঙ্কা বাজিল। অনেক মারামারি কাটাকাটি করিয়া শেষে তিনি জয়ী হইলেন। তার পর তাঁর মনে যাহা ছিল, তাহাই হইল,—তিনি ভারতের বাদশা হইয়া সিংহাসনে বসিলেন।

আমরা অবশ্য এক নিঃশ্বাসে—দুই-চারিটি কথাতেই—বাবরের ভারত-জয়ের কথা তোমাদিগকে বলিয়া দিলাম। কিন্তু তাঁহাকে ইহার জন্য যে কি কষ্ট, কি মেহনৎ, কি ফিকিরফন্দী করিতে হইয়াছিল, তাহা খতাইয়া লিখিলে একখানি বেশ মোটা বই হইয়া পড়ে। যাক্, সে-সকল কথা এখন তোমাদের শুনিবার দরকার নাই; বড় হইলে ইতিহাস পড়িয়া সে-সব কথা তোমরা জানিতে পারিবে। এই মহাবীর বাবরের কিরূপ মনের জোর, ধর্ম্মে বিশ্বাস, আর ছেলের উপর টান ছিল, সেই কথা আজ তোমরা শুনিয়া রাখ।

ভারতবর্ষের বাদশা হইয়া বাবর বেশ মনের সুখেই রাজত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু মানুষের সুখ কখনও একটানা হয় না, বাদশার জীবনেও তাহা হয় নাই। তাঁহার বড় ছেলের নাম—হুমায়ূন মীর্জ্জা। মীর্জ্জাকে বাদশা প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসিতেন। আপনার ছেলেকে আবার ভাল না বাসে কে? কিন্তু তলাইয়া দেখিলে প্রাণের চেয়ে কাহাকেও বড় কেহ ভালবাসে না—ছেলেই হোক, আর যেই হোক। কিন্তু বাদশা বাবর সত্যসত্যই পুত্র হুমায়ূনকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসিতেন।

একদিন তাঁর এই পুত্র খুব অসুখে পড়িলেন। বাদশার ছেলে, তার উপর আবার সকলকার বড়, বাদশার পরে বাদশা হইয়া তাঁরই তো রাজ্যরক্ষা আর দেশ-শাসন করিবার কথা। চিকিৎসাপত্র কিছুরই ত্রুটি হইল না; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না,—তাঁর অবস্থা দিন দিনই খারাপ হইয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে আর জীবনের আশা নাই দেখিয়া চিকিৎসকেরা সব মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল।

অন্দরে তখন কান্নাকাটি পড়িয়াছে—হুমায়ূনের মা মাহম্ আব কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছেন না। আর বাদশা? পুত্রের রক্তহীন মলিন মুখের দিকে চাহিয়া দুঃখে তাঁর বুক ফাটিয়া যাইতেছে,—কি যে করিবেন, কি যে হইবে, ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। এমন সময় একটা বড় আশার কথা কে যেন তাঁর কানে কানে বলিয়া গেল—'জনাব্, চিকিৎসাপত্র যাহা করিবার তাহা তো করিয়া দেখিলেন, এখন খোদাকে ডাকুন, আর একটা খুব বড়গোছের মানত করুন—যার চেয়ে বড় মানত আর কিছুই নাই। দুনিয়ার মালিক তুষ্ট হইলে আপনার ছেলে ভাল হইতে কতক্ষণ?'

যেন অন্ধকারে পথহারা বাদশা হঠাৎ পথের রেখা দেখিতে পাইলেন; ভাবিলেন, বেশ কথা, একটা খুব বড় রকমের মানতেই যদি পুত্রের জীবন রক্ষা হয়, আমি খোদার দরবারে তেম্নি একটা মানতই পেশ করিব; এই পৃথিবীতে প্রাণের

মত দামী ও ভালবাসার সামগ্রী তো আর কিছু নাই, আমি আমার এই প্রাণটাই তাঁকে উপহার দিব—উঠুক আমার স্নেহের পুত্তলী বাঁচিয়া।

কথা শুনিয়া বাদশার আপনজনেরা, বন্ধুবান্ধবেরা একেবারে হা-হা করিয়া উঠিল,—“জনাব্, অমন কথা মুখেও আনিবেন না। মানতের জন্য, সিন্নির জন্য, ভাবনা কি আপনার? ঘরে তো ধনরত্নের অভাব নাই, মণির সেরা যে কোহিনূর, তাহাও তো আপনি মানত করিতে পারেন। এমন কি, ইচ্ছা করিলে সমস্ত ধনভাণ্ডারও ধরিয়া দিতে পারেন। নিজের প্রাণটা কেন আপনি দান করিতে যাইবেন?”

বাদশা স্থির হইয়া বলিলেন, “আমার পুত্রের জীবনটা কি এতই তুচ্ছ, এতই যৎসামান্য—যার সঙ্গে অসার মণিমুক্তার তুলনা হয়!—এইগুলির বদলে যার মহামূল্য জীবন ফিরাইয়া আনিতে পারা যায়! বাদশার পুত্রের জীবন, বাদশার জীবনের তুল্য, খোদার নামে আমি আমার জীবনই মানত করিলাম।”

ইহার উপরে আর কথা নাই, সকলেই একেবারে চুপ করিয়া গেল।

বাদশা ধীরে ধীরে হুমায়ুনের ঘরে ঢুকিয়া মাথার কাছে একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তার পর গম্ভীরমুখে বিছানার চারি দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে একমনে ডাকিতে লাগিলেন, “খোদা, দিনদুনিয়াব মালিক! যদি জীবন দিলে

জীবন মিলে, তাহা হইলে আমি বাবর শা,—আমার নয়নের মণি, জীবনের জীবন, হুমায়ুনের জন্য আমি আমার জীবন দিলাম ; তুমি কি মেহেরবানি করিয়া ইহা লইবে না ?”

এই ডাকের মত ডাকে সত্যসত্যই কে যেন শূন্য হইতে সাড়া দিল। বাদশা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “আর ভাবনা নাই, ভাবনা নাই, আরজি মঞ্জুর হইয়াছে—পুত্রের অসুখ আমার দেহে আসিয়াছে।” ইহার পরেই বাবরের সুস্থ শরীরে রোগ দেখা দিল, আর তাঁর মরণাপন্ন পুত্র হুমায়ুন আরাম হইয়া উঠিলেন।

তার পর রাজ্যের বড় বড় আমীর-ওমরাদের ডাকা হইল। বাদশা তাঁহাদের হাতে হুমায়ুনকে সঁপিয়া দিয়া, আর তাঁহাকেই সিংহাসনে বসাইবার আদেশ দিয়া, মনের সুখে জন্মের মত চক্ষু বুজিলেন।





ভিস্তি বাদশা

হিন্দু-রাজাদের পর এ দেশের রাজা হইয়াছিলেন—পাঠান-বংশের মুসলমানেরা। অনেক দিন এক জায়গায় বসবাস করিলে তার উপরে মানুষের মন বসিয়া যায়। পাঠানরা অনেক দিন এখানে থাকিয়া, তার উপর আবার রাজত্ব করিয়া পুরাদস্তুর এ দেশের লোক হইয়া গিয়াছিল। দেশটার উপর কাজেই তাদের টান হইয়াছিল খুব বেশী।

কিন্তু মোগল-বংশের বাবর শা তাদের বড় সাধে বাদ সাধিলেন। তিনি তাদের হাত হইতে রাজ্যটা ফস্ করিয়া কাড়িয়া লইয়া সিংহাসনের উপর গ্যাঁট হইয়া বসিলেন। পাঠানরা রাগে ফুলিতে লাগিল, আর দূর হইতে তাহাদের পুরানো সিংহাসনের দিকে তাকাইতে লাগিল;—ভাবখানা এই যে, পারে তো বাঘের মত মোগল-বাদশার ঘাড়

মটকাইয়া রক্ত খায়, আর সিংহাসনে বসার মজাটা দেখাইয়া দেয় খুব ভাল রকম। কিন্তু ওদিকে কি ঘেঁষিবার জো আছে? বাবর শা'র যেমন বুদ্ধি, তেম্‌নি দাপট্‌; তাঁর কাছে কারও চালাকি করিবার সাধ্য নাই। তিনি দুশমনদের কোণঠাসা করিয়া রাখিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

বাবর শা'র মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে হুমায়ূন বাদশা হইলেন। তখন তাঁর বয়স বাইশ বছর। হুমায়ূনও 'বাপকা বেটা' বটে, কিন্তু অতি-আদরে মাটি হইয়াছিলেন। বাদশার বড় ছেলে, আদরের দুলাল,—এত দিন খোশখেয়ালে কাল কাটাইয়াছেন; রাজ্য আর রাজপাটের ভাবনা তাঁর মাথায় বড়-একটা ঢোকে নাই। তাঁহাকে রাজপাটে বসিতে দেখিয়া পাঠানরা সব গা-ঝাড়া দিয়া চন্‌মনে হইয়া উঠিল। এই পাঠানদের মধ্যে একটা লোকের মত লোক শের খাঁ। তাঁর যেমন বুদ্ধি-বিবেচনা, গায়ের জোর আর লোকবলও তেম্‌নি। সামান্য জায়গীরদারের ছেলে হইলে কি হয়? নিজের চেষ্টা-যত্নে এখন রাজা-বাদশার সামিল হইয়াছেন; কিন্তু তাহাতেও তিনি খুশী নন, তাঁর আরও বড় হইবার সাধ। যে-সব পাঠান চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া ছন্নছাড়ার মত দিন কাটাইতেছিল, তিনি তাদের এক করিয়া দল বাঁধিলেন। চুনারে একটা খুব ভাল কেল্লা ছিল, শের খাঁ সেটাকে দখল করিয়া লড়াই করিবার বেশ সুবিধা করিয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে বিহার, এমন কি গোটা বাংলা দেশটাই, তাঁহার পায়ের তলায় আসিল।

হুমায়ূনের চমক লাগিয়া গেল। তাই তো, জায়গীরদারটা তো বেজায় বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিল দেখিতেছি! বিহিত না করিলে তো কোনমতেই চলিতেছে না।

বাংলার রাজধানী গৌড় তখন ভারি চমৎকার জায়গা। হুমায়ূন ঠিক করিলেন, আগে চাই গৌড়; তার পর অন্য কথা। বাদশা খুব ঘটা করিয়া গৌড়ে যাত্রা করিলেন, কিন্তু সেখানকার ধনদৌলৎ হাত করিতে পারিলেন না। পৌঁছিবার আগেই শের খাঁ সে-সব লইয়া সরিয়া পড়িয়াছেন।

হুমায়ূন হুহু করিয়া আসিয়া গৌড়ের মধ্যে ঢুকিলেন। ঢুকিয়াই তাঁহার তাক্ লাগিয়া গেল। দেশ না—এ সোনার ছবি? যা দেখেন, তাই সুন্দর! সুন্দর নদনদী! সুন্দর গাছপালা! সুন্দর ফল-ফুল-পাখী—কত রকমের, কত রঙ-বেরঙের! আকাশ কি নীল, বাতাস কি মিষ্টি—ফুরফুরে! হুমায়ূন তো একেবারে মশগুল্। বাদশার ছেলে তিনি, এত দিন মনে মনে যে-সকল সুখের, যে-সকল শোভার কথা ভাবিয়াছেন, এই দেশটা যে সেই-সব সুখ, আর শোভায় একেবারে ঠাসা! বাদশা তাঁর এই মনের মত দেশে আসিয়া, রাজধানীর কথা একদম ভুলিয়া গেলেন। কি করিতে আসিয়াছেন, কি করা উচিত, এমন করিয়া ভুলিয়া থাকার কি বিপদ, কিছুই তাঁহার মনে হইল না।

রাজধানীতে মহাগোল। উজীর-নাজিররা দেখিলেন, অনেক দিন হইয়া গিয়াছে—বাদশার ফিরিবার নামগন্ধ নাই।

এমন করিয়া রাজপাট খালি রাখিলে কি রাজ্যশাসন চলে? তাঁরা বাদশার সৎমার ছেলে হিন্দালকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ভিতরে ভিতরে ফন্দী আঁটিতে লাগিলেন। হিন্দালও তাঁদের কথায় নাচিয়া উঠিলেন।

বিপদ যে এত বেশী, বাদশা তা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিলেন—আগ্রার দিকে।

শের খাঁ ধূর্ত্তের শিরোমণি ;—ভিতরে ভিতরে সব খবরই রাখিতেন। তিনি ভাবিলেন, এই তো সুযোগ ; এইবার বাঘের বাচ্চাকে পিঁজরায় পূরিব। তার পর ?—তার পর হিন্দুস্থানের মালিক আর কে ?—আমি খোদ শের খাঁ !

বাদশার আগ্রা ফিরিবার পথে শের খাঁ ফৌজ লইয়া ওৎ পাতিয়া বসিলেন। হুমায়ূন কিন্তু ইহার কোনো খবরই রাখিতেন না। বক্‌সারের কাছে চৌসায় পৌঁছিয়া তাঁহার আক্কেল গুড়ুম হইয়া গেল। শের খাঁ এ কি কাণ্ড করিয়াছে! তাঁহাকে ধরিবার জন্য যে একেবারে বেড়াজালের ব্যবস্থা! কিন্তু হুমায়ূনের সঙ্গে বেশী লোকজন নাই। শের খাঁর এত সৈন্যের সঙ্গে তিনি কেমন করিয়া আঁটিয়া উঠিবেন? আর কোনো উপায় না দেখিয়া তিনি শের খাঁর কাছে আপোসের কথা বলিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু বাগে পাইলে কোন্ শিকারী শিকার ছাড়িয়া কথা কয়? আপোসের কথা লইয়া দিনকতক খুব গুল্‌তানি চলিল। তার পর, বলা নাই কওয়া নাই, একদিন ভোরবেলা বাদশা আর তাঁর লোকজন যখন আরামে

ঘুমাইতেছেন—শের খাঁ তখন সৈন্যসামন্ত লইয়া একেবারে হুড়মুড় করিয়া গিয়া পড়িলেন তাহাদের ঘাড়ে। এই আচম্‌কা আক্রমণে মোগলরা পড়িয়া মার খাইতে লাগিল। চারি দিকে 'মার্ মার্ ধর্ ধর্, গেলুম রে মলুম রে' শব্দ। মোগলরা প্রথমটা একটু সোরগোল করিল; তার পর বেগতিক দেখিয়া যে যেদিকে পারিল—দিল ছুট। কাছেই গঙ্গা—বর্ষাকালের ভরা গঙ্গা,—কূল ছাপাইয়া জল, শত্রুর ঠেলা খাইয়া কত লোক ডুবিয়া মরিল তার ঠিক নাই। অনেকেই ধরা পড়িয়া বন্দী হইল।

আর বাদশা? তিনি তখন ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া মুক্তার গাছে হীরার ফুলের স্বপন দেখিতেছিলেন। জাগিয়াই দেখেন—মহামারী ব্যাপার! বুঝিলেন, রাতের স্বপন একেবারেই কিছু নয়—মিথ্যে, ভূয়ো, ফক্কিকারি। আর এখনকার এই ব্যাপারটা যেমন সত্য, তেম্‌নি সঙ্গীন। শের খাঁর লোকেরা জোয়ারের জলের মতো সোঁ-সোঁ করিয়া তাঁহার তাঁবুর মধ্যে ঢুকিতেছে। তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া, তিনি আগে ছেলে-মেয়েদের বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অসম্ভব—ভিড় ঠেলিয়া এগোয় কা'র সাধ্য! ঘোড়ার পিঠে উঠিয়া খুব জোরে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। লড়াইয়ের তেজী ঘোড়া, বাতাসের আগে বোঁ-বোঁ করিয়া ছুটিয়া চলিল। ঘোড়াও ছোটে, শত্রুর লোকও পিছু পিছু ছোটে। আর কোনো দিকে পথ না পাইয়া, সাম্‌নে যে গঙ্গা, তারই মধ্যে

বাদশাকে ঘোড়াসুদ্ধ ঝপাৎ করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইল। গঙ্গায় তখন কি তোড়! তোড়ের মুখে একখান কুটো ধরিলে একশোখান হইয়া যায়;—বাদশার ঘোড়া ভাসিয়া গেল,—তিনি নাকানি-চোবানি খাইতে লাগিলেন।

মান গেল, ইজ্জৎ গেল, স্ত্রী-কন্যা কোথায় গেল ঠিক নাই। খালি প্রাণটা, তাও বুঝি আর থাকে না,—'খোদা, মুশকিলের আসান্, অকূলের কূল, হতাশের আশা, কোথায় তুমি—কোথায়?' বাদশা বড় কাতর হইয়া খোদাকে ডাকিতে লাগিলেন।

জোরগলায় কে বলিয়া উঠিল, 'এই যে, এই যে,—হাত দাও।'

তবে কি সত্যসত্যই খোদা? বাদশা মাথা তুলিয়া অবাক্ হইয়া দেখিলেন, একটা লোক বাতাস-ভরা 'মশক্' লইয়া তাঁহাকে বাঁচাইতে আসিয়াছে। হুমায়ূনের মনে হইল, খোদা না হোক—খোদারই খেলা—তিনিই এ বান্দাকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছেন! তাঁর দয়ার কথা ভাবিতে ভাবিতে বাদশা দুই হাতে মশক আঁকড়াইয়া ধরিলেন।

তোমরা বোধ হয়, পথে পথে মশকে করিয়া ভিস্তিদের জল দিতে দেখিয়াছ। 'মশক' চামড়ার বড় একটা থলে; ভিতরে বাতাস ভরিলে সেটা ঠিক ফুটবলের ফোলা ব্লাডারের মত ফাঁপিয়া উঠে। লোকটা এমনি একটা মশকে করিয়া বাদশাকে ওপারে টানিয়া লইয়া চলিল। আর একটু হইলেই

যে তিনি দরিয়ায় ডুবিয়া মরিতেন! এই অচেনা লোকটিই হইল তাঁর প্রাণ বাঁচাইবার উপলক্ষ্য! হুমায়ুনের প্রাণটা ছিল খুব নরম। লোকটির ব্যবহারে তিনি একেবারে গলিয়া গেলেন। ওপারে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই-সাহেব, তোমার নাম ?"

"আমার নাম, নিজাম।"

নিজাম-উদ্দীন্ আউলিয়া দিল্লীর একজন মস্ত বড় সাধু। দেশ-বিদেশের অনেকেই তাঁর নাম জানিত। বাদশা খুশী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "নাম শুনিয়া আমার নিজাম-উদ্দীন্ আউলিয়ার কথাই মনে হইতেছে!"

নিজাম বলিল, "না সাহেব, কা'র সঙ্গে কা'র কথা! আমি সাধুও নই, ফকীরও নই,—গেরস্ত—গরীব মানুষ, ভিস্তির কাজ করি, জল জুগিয়ে খাই।"

হুমায়ূন বলিলেন, "তা হোক, গরীব হইলেই কি সে অসাধু হয় ? আমি তোমার উপর ভারি খুশী হইয়াছি। তুমি আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছ। আজ হইতে তুমি আমার দোস্ত।"—বলিয়া বাদশা নিজামকে নিজের পরিচয় দিলেন।

বাদশার তো রাজবেশ ছিল না। শত্রুর তাড়াহুড়ায় ব্যস্ত হইয়া বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়াছিলেন। এতক্ষণ ভিস্তি তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। পরিচয় পাইয়া তাহার তাক্ লাগিয়া গেল। বাদশা! উজীর না, নাজির না,—একেবারে খোদ শাহান্‌শা বাদশা! আজ সকালে কা'র মুখ দেখিয়া

সে উঠিয়াছিল রে! এই এত বড় মুলুকটা!—হাঁটিয়া হাঁটিয়া যার কিনারাই সে এত দিনে পাইল না,—সেই ছুনিয়া-জোড়া মুলুকের মালিক, ছুয়ারে যাঁর হাতীবাঁধা, ভাঁড়ারে যাঁর টাকা—ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে সোনার টাকা, অগন্তি অফুরন্তি—সেই বাদশা তার চোখের সাম্‌নে, হাত ধরিয়া আদর করিয়া বলিতেছে, 'তুমি আমার দোস্ত!' এমন তাজ্জবের কথা নিজাম কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই; সে অবাক্ হইয়া বাদশার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ব্যাপারটা স্বপ্নের চেয়ে, তৈরি গল্পের চেয়ে আজগবী ঠেকিলেও, সেটা যে মিথ্যা নয়—সত্য, তা নিজাম সহজেই বুঝিতে পারিল। এমন রূপ, এমন মিষ্টি কথা, এমন দিলদরিয়া মেজাজ, বাদশা ছাড়া কি আর কারও হইতে পারে?

হুমায়ূন বলিলেন, "ভাই-সাহেব, তোমার কি চাই—বলো, তুমি যা চাহিবে, আমি তোমাকে তাই দিব।"

আর কি চাওয়া-চিন্তা আছে! নিজামের চমকের উপরে চমক লাগিয়া গিয়াছে। সে কথাই কহিতে পারে না।

বাদশা বলিলেন, "তুমি আজ আমার যে উপকার করিলে, তার শোধ দেওয়া যায় না; শোধ আমি দিতেও চাই না। কিন্তু তোমার কোনো উপকার করিতে পারিলে আমি খুব খুশী হই। যখন তুমি আমাকে মরণের হাত হইতে বাঁচাইয়াছ, তখন আমি শীঘ্র মরিব না, আর সিংহাসনে না বসিয়াও ছাড়িব না। টাকা চাও টাকা, রাজ্য চাও রাজ্য,

আমীরি চাও আমীরি—সবই তোমাকে আমি দিতে পারিব। কি চাই তোমার, বলো ?”

নিজাম ভাবিতে লাগিল। চাই-ই যদি, খুব মনের মতই একটা কিছু চাহিতে হইবে। দেওয়ার মালিক বাদশা, দিলে দেওয়ার মতই দিতে পারে। শুধু দুঃখ, আর দুঃখ ; দুঃখ ছাড়া সুখের মুখ তো একদিনও দেখি নাই। ছেঁড়া কাপড় পরিয়া, আর ছেঁড়া মাদুরে শুইয়া, কত দিন আল্লাকে ডাকিয়াছি—‘হে আল্লা, হে দুনিয়ার মালিক, তোমার দয়ায় আঁধার কাটিয়া দিন হয়, আস্‌মানে ফুল ফোটে, অকূল দরিয়ায় কূল মেলে, আর আমার দিন কি এম্‌নি করিয়াই কাটিবে ? হঠাৎ কি আমি একদিন রাজা-বাদশা হইয়া যাইতে পারি না ? আমার এই ছেঁড়া কাপড়টা রাজার পোশাক, আর আমার ছেঁড়া মাদুরটা একখানা পুরু নরম গদি হইয়া যাইতে পারে না ?’ হইলে ভারি মজা হয় কিন্তু, মশকও টানিতে হয় না, আর মানুষের ধমকও খাইতে হয় না। খালি মানুষকে ধমক দিতে, আর হুকুম করিতেই দিন কাটিয়া যায়! নিজামের মনে হইল, এত দিনে বুঝি আল্লা মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন—আমার এত কালের সাধটা পূরাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি সবজান্তা কি না, তাই।

নিজাম বাদশাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আমি যা চাইবো, তুমি আমাকে তাই দেবে সত্যি ?”

বাদশা বলিলেন, “হঁা ভাই, সত্যি।”

নিজাম বলিল, “যদি বলি, সাত রাজার ধন এক মাণিক ?”

বাদশা বলিলেন, “তাই পাইবে। আল্লার মর্জ্জিতে আমার কিছুরই অভাব নাই—ঘরে অমন ঢের ঢের মাণিক আছে।”

ঘরে ঢের ঢের মাণিক! আজব কাণ্ড আর বলে কা’কে! নিজাম ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারে না কি চাহিবে—মাণিক, তালুক-মুলুক, না বেগম! ঠিক যেন বাঁশবনে ডোম কাণা।

অনেক ভাবিয়া নিজাম বলিল, “যাক্, ভাই-সাহেব, এখন তো আর তোমার কাছে কিছু নেই যে আমাকে দেবে ? তুমি তোমার দৌলতখানায় যাও ; তার পর যা চাইতে হয়, তোমার কাছে গিয়ে চাইবো। তুমি যে দোস্ত ব’লে আমার হাত ধরেছ, এই এখন বহুৎ খুব।”

“বেশ তাই হবে। তোমার কথা আমি ভুলিব না।”—বলিয়া বাদশা চলিয়া গেলেন।

গরীব ভিস্তি একেবারে আহ্লাদে আটখানা হইয়া দেশে ফিরিল। এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইতেই বলিল, “ওরে শুনেছিস, দিল্লীর বাদশা আমার এক দোস্ত—তাঁর সঙ্গে আমার ভারি ভাব।”

বন্ধু অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল—নিজামের মাথাটা খারাপ হইয়া যায় নাই তো? অনেকক্ষণ ঠাহর করিয়া দেখিয়া সেরূপ মনে হইল না। বলিল, “বাদশা তো

আর মুলুকে লোক পান নি ভাব করবার, তাই ভিস্তির সঙ্গে দোস্তি !”

নিজাম বলিল, “বাদশা যে আর একটু হ’লেই জলে ডুবে মরতো, আমিই যে তাঁকে জল থেকে তুলে বাঁচাই, আর তাই জন্যেই তো তাঁর সঙ্গে আমার ভাব।”

বন্ধু বলিল, “বাদশা কখনও জলে ডোবে ?”

নিজাম বলিল, “কেন ডুববে না ? শের খাঁর সঙ্গে যে তাঁর লড়াই হ’ল।”

বন্ধু বলিল, “হ’লই বা লড়াই। লড়াই হ’লেই বুঝি বাদশা জলে ডোবে ? আর ডোবেই যদি নিতান্ত, তা হ’লে তাঁকে ভিস্তি বাঁচাবে কেন ?—বাঁচাবে হয় উজীর, নয় নাজির, নিদেন পক্ষে কোটাল।”

বন্ধুর কাছে মুখ না পাইয়া নিজাম স্ত্রীর কাছে গেল। স্ত্রীও তাহার কথা বিশ্বাস করিল না। তার পর গাঁয়ে গাঁয়ে রটিয়া গেল যে, নিজাম খেপিয়াছে—তার মাথা খারাপ হইয়াছে। পথে বাহির হইলেই ছেলের পাল তার পেছনে লাগে, আর বলে—‘ওরে ও বাদশার দোস্ত! দরবারে যাবি কবে ?’

নিজাম রাগিয়া-মাগিয়া বলে—‘সবুর, সবুর—দিনকতক সবুর।’

ছেলেরা হাততালি দিয়া খিল খিল করিয়া হাসে, আর বলে—‘লাড্ডু লাড্ডু—দিল্লীকা লাড্ডু !’

কিছু দিন ঐই রকম জ্বালাতন-পোড়াতন হওয়ার পর, কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিজাম একদিন হঠাৎ দেশ ছাড়িয়া পলাইল। স্ত্রী কাঁদিয়া-কাটিয়া মাটি ভিজাইল, আর গাঁয়ের লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল—'পাগলাটাকে ছাড়িয়া দেওয়া ভাল হয় নাই, বাঁধিয়া রাখিলেই ঠিক হইত।'

এদিকে নিজাম একেবারে রাজধানী আগ্রায় গিয়া হাজির! সিপাই-সান্ত্রী পাহারাওয়ালার দল কি তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে চায়? অনেক কষ্ট করিয়া, অনেক রকমে হয়রান হইয়া তার পর সে বাদশার নাগাল পাইল। নিজামের যেমন চেহারা, তেম্‌নি তার কাপড়-চোপড়ের দশা, আর কোনো বাদশা হইলে নিশ্চয় তখনই তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া বিদায় করিয়া দিতেন। কিন্তু বাদশা হুমায়ূনের দিল্‌টি ছিল দুনিয়া-ছাড়া, তিনি নিজামকে দেখিয়া খুশী হইলেন, আদর করিয়া কাছে বসাইলেন।

নিজাম বলিল, "ভাই-সাহেব, তুমি আমার কাছে একটা কড়ার করেছিলে, মনে আছে তো?"

বাদশা বলিলেন, "আছে বৈ কি দোস্ত, তোমার কি চাই বলো?"

নিজাম বলিল, "তুমি যে আমার দোস্ত, সে কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। শুধু একদিন বলেছিলাম যে, তোমার সঙ্গে আমার ভাব, সেই থেকে সবাই আমাকে খেপায়, আর

যা খুশী তাই বলে! যাতে সবাই আমার কথা বিশ্বাস করে, তাই তোমাকে করতে হবে।"

বাদশা বলিলেন, "বেশ, কি করিতে হইবে বলো?"

নিজাম বলিল, "বাদশার পোশাক প'রে তুমি যে সিংহাসনটায় বসো, সেই সিংহাসনটায় আমি একবার বসবো, আর তোমার মত হুকুম চালাবো।"

বাদশা বলিলেন, "বেশ কথা, তার জন্য আর ভাবনা কি?"

তার পর নিজামের সঙ্গে যুক্তি করিয়া বাদশা দরবারের একটা দিন ঠিক করিলেন। নিজামকে সেলাম জানাইবার জন্য রাজ্যের সব আমীর-ওমরাদের উপর হুকুম হইল।

হুকুম শুনিয়া সকলেরই চোখ কপালে উঠিল! ভিস্তি বাদশা হইয়া দরবার করিবে, আর সবাইকে সেখানে গিয়া সেলাম ঠুকিতে হইবে! যেমন খামখেয়ালী বাদশা, তেম্নি তাঁর হুকুম! সকলেই মনে মনে বাদশার উপর খাপ্পা হইয়া উঠিল। কিন্তু হইলে কি হইবে বলো? বাদশার হুকুম কি কারও অমান্য করিবার জো আছে?

এদিকে সেই যে নিজামের গাঁয়ের লোক—যারা নিজামকে বাদশার দোস্ত বলিয়া খেপাইত, তারাও সেই দরবারের দিনে রাজধানীতে হাজির হইবার হুকুম পাইয়া হতভম্ব হইয়া গেল। নিজাম তো ঠিকই বলিয়াছিল,—বাদশা তার দোস্ত! তাহাকে খেপাইবার আগে কথাটা যদি তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিত! হায় রে হায়, তাহারা কি বোকামিই না করিয়াছে! এখন

উপায়? কঠিন সাজা দিবার জন্য নিশ্চয় তাহাদের ডাক পড়িয়াছে। হয়তো তাহাদের গর্দ্দানই যাইবে!

কাঁপিতে কাঁপিতে তাহারা দরবারে গিয়া হাজির। সেখানে তাহারা দেখিল, তাহাদের গাঁয়ের নিজাম ভিস্তি সত্যসত্যই সিংহাসনে বসিয়া বাদশা হইয়াছে! গায়ে তার রাজার পোশাক, হাতে তার দণ্ড। উজীর-নাজির সিপাই-সান্ত্রীতে দরবার-ঘর গম্‌গম্‌ করিতেছে।

পূরোপূরি একটা দিন—সকাল হইতে সন্ধ্যা—নিজাম ভিস্তি, বাদশা হইয়া ইচ্ছামত হুকুম চালাইল। যত খুশী ধনদৌলৎ লইল, যত খুশী দান-খয়রাৎ করিল। কাহাকেও দিল পুরস্কার—কাহাকেও করিল তিরস্কার। গাঁয়ের লোকদের উপর হুকুম হইল যে, তারা যে যত পারে, টাকাকড়ি ঘাড়ে করিয়া ঘরে লইয়া যাক। গর্দ্দান্ তো গেলই না, তার উপর বহুৎ টাকাকড়ি পাইয়া মনের আনন্দে তাহারা নিজাম বাদশার জয়জয়কার করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

নিজামের মনে আর কোন আপসোস রহিল না।





তেলে আর জলে যেমন কখনও মিশ খায় না, তেমনি মোগলে আর পাঠানে বনিবনা হইবার জো ছিল না। মোগলদের আগে পাঠানরাই ছিল ভারতের মালিক। মোগল-বাদশা বাবর পাঠানদের হাত হইতে সিংহাসনটা কাড়িয়া লইয়া তাহাদের কোণঠাসা করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাবরের ছেলে হুমায়ূন বাদশা হইয়া যখন বিলাসে আর ফুর্ত্তিতে মাতিয়া উঠিলেন, তখন বিহার অঞ্চলে শের শা নামে এক পাঠান মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছেন। লোকটি যেমন চালাক-চতুর, তেমনি বীর। সামান্য ঘরে জন্ম হইলেও নিজের চেষ্টাতে তিনি দেখিতে দেখিতে খুব বড় হইয়া উঠিয়াছেন। চুনারে ছিল একটা মস্তবড় মজবুত কেল্লা, এই কেল্লাটা হাত করায় তাঁহার নামটা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল, আর তাঁহার দুর্দ্দান্ত সেনাসামন্তেরা মোগল-বাদশার তোয়াক্কা না রাখিয়া বাংলার রাজধানী গৌড় লুঠিতে লাগিল।

খবর পাইয়া বাদশা হুমায়ূনের চট্‌কা ভাঙিল ; ভাবিলেন, পাঠানটা তো বিষম ফ্যাসাদ বাধাইল দেখিতেছি! ইহাকে

আর কিছুতেই বাড়িতে দেওয়া উচিত হইতেছে না। দিলে আরও কি অনর্থ ঘটায় তাহার ঠিক কি? হুমায়ূন বাদ্‌শা আর এতটুকু সময় নষ্ট না করিয়া লোক-লস্কর কামান-বন্দুক লইয়া ছুটিলেন শের শাকে জব্দ করিতে।

শের শা ভাবিয়া দেখিলেন, এই অগুনতি মোগল সৈন্যের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করার মত বোকামি আর কিছুই হইতে পারে না। তাহাতে কেল্লাও যাইবে, দলবলসুদ্ধ মারাও যাইতে হইবে। তাই মোগলদের বেগ দিবার জন্য চুনারের কেল্লায় কিছু লোক রাখিয়া তিনি সেখান হইতে বাহির হইলেন—আগে কেল্লার মেয়েছেলেদের বাঁচানো দরকার। চব্বিশ-পঁচিশ ক্রোশ দূরে বরকুণ্ডায় একটা কেল্লা ছিল। শের চট্ করিয়া মেয়েদের চুনার-দুর্গ হইতে সরাইয়া, উপস্থিত সেই কেল্লায় লইয়া গেলেন। কিন্তু বরকুণ্ডার দুর্গটা ছোট, খুব যে মজবুত তাও নয়; সেখানে এত মেয়েছেলের জায়গা হওয়াও দায়। কাজেই একটা বড়গোছের কেল্লায় তাহাদের রাখিতে না পারিলে শের নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। বলা তো যায় না, মোগলেরা যদি চুনারের কেল্লা ফতে করিয়া এই বরকুণ্ডার দিকে ঠেল মারে, তখন প্রাণের চেয়েও বড় যে ইজ্জৎ—মেয়েদের সেই ইজ্জৎ বাঁচানো দায় হইবে।

তখনকার দিনে রোটাসগড়ের মত জবর কেল্লা গোটা ভারতবর্ষে আর একটিও ছিল না।* অনেক কাল হইতেই এই

দুর্গের মালিক—হিন্দু রাজারা ; কোন মুসলমান রাজাই ইহা দখল করিতে পারেন নাই। শের শা ঠাওরাইলেন, এই রোটাসগড়ের মত শক্ত কেল্লায় মেয়েছেলেদের রাখিতে পারিলে উপস্থিত মান বাঁচে, মুশকিলেরও আসান্ হয়। তিনি তাই রোটাসগড়ের রাজার মন ভিজাইবার জন্য খুব দামী দামী ভেট পাঠাইলেন, আর নিজের বিপদের কথা জানাইয়া কেল্লার মধ্যে মেয়েদের মাথা গুঁজিবার মত ঠাঁই চাহিলেন।

চূড়ামন নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল রাজার মন্ত্রী। রাজাকে এই প্রস্তাবে রাজী করাইবার জন্য শের শা ঐ ব্রাহ্মণকে অনেক টাকা ঘুষ দিয়াছিলেন। তাঁহার পরামর্শে, আর ভেটের ঘটা দেখিয়া রাজা মেয়েছেলেদের জায়গা দিতে রাজী হইলেন। কিন্তু তাঁহার আদেশ-মত শের শা মেয়েদের সঙ্গে লইয়া যাই কেল্লার কাছাকাছি আসিয়াছেন, অমনি রাজা বাঁকিয়া বসিলেন—কাহাকেও আশ্রয় দেওয়া হইবে না। রাজার মাথায় তখন এই ভয় ঢুকিয়াছে যে, হুমায়ূন হইলেন কত ধনজন-সেনাসামন্তের মালিক—ভারতের বাদশা, শের শা তাঁহার কাছে নিতান্তই হীন নগণ্য লোক। এই শেরের মেয়েছেলেদের কেল্লায় জায়গা দিলে ইচ্ছা করিয়া বাহিরের শত্রু ঘরে ডাকিয়া আনা হইবে—রাজাকে বাদশার কোপে পড়িতে হইবে।

কিন্তু শের শা তখন মেয়েছেলেদের লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার পিছনে শত্রু। রাজার উচিত ছিল,

সব দিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তবে তাঁহার কথায় রাজী হওয়া। ফাঁপরে পড়িয়া শের শা রাজার উপর যা চটিয়া গেলেন, তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার নয়। মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিলেন, কোন রকমে রাজাকে একবার বাগে আনিতে পারিলে প্রতিফলটা তিনি খুব ভাল রকমেই দিবেন। চতুর শের শা মনের কথা বাহিরে কিছুই প্রকাশ না করিয়া রাজাকে খুব অনুনয়-বিনয় করিয়া এক চিঠি লিখিলেন। মন্ত্রী চূড়ামন কেমন লোক তাহা তিনি আগেই টের পাইয়াছিলেন; এবার আরও বেশী করিয়া দিলেন তাঁহাকে ঘুষ—একেবারে ছয় মণ সোনা; আর জানাইলেন—'যেমন করিয়া পারেন, রাজাকে চট্‌পট্ পটাইয়া-সটাইয়া অন্ততঃ দিনকতকের জন্য মেয়েদের কেল্লায় রাখিবার ব্যবস্থা করুন।'

লোভী ব্রাহ্মণ একেবারে ছয় মণ সোনা পাইয়া তো আহ্লাদে আটখানা। তিনি রাজাকে জিদের উপর জিদ করিতে লাগিলেন—'শের শার মেয়েদের দুর্গে থাকবার জায়গা দিতেই হবে। না দিলে ভাল হবে না। বাদশা আজ বিহারে আছেন, কাল হয়তো শেরের সঙ্গে ভাব ক'রে এখান থেকে স'রে পড়বেন, তখন? তখন কি শের এর শোধ না নিয়ে ছাড়বে—মনে করেছেন?'

চূড়ামন যতই বুঝান, রাজা ততই অবুঝ হইয়া ঘাড় নাড়েন—কিছুতেই রাজী হন না। বেগতিক দেখিয়া মন্ত্রী চূড়ামন তখন শক্ত হইয়া বলিলেন—'নিরাশ্রয়কে আশ্রয়

দেওয়াই রাজার ধর্ম্ম। আপনি রাজা, আমি মন্ত্রী। আপনার হয়ে আমি শের শার মেয়েছেলেদের আশ্রয় দেব ব'লে কথা দিয়েছি। মানুষের মুখের কথাই হচ্ছে সব। সেই কথাই যদি গেল, তা হ'লে আর বেঁচে থেকে লাভ কি? না না, আমার কথার খেলাপ কিছুতেই হ'তে পারবে না, আমি আত্মহত্যা করব—আর দেরি নয়, এখনি আমি আত্মঘাতী হ'তে চাই। মরুন আপনি ব্রহ্মহত্যার পাপে নরককুণ্ডে প'চে।'—বলিয়া চূড়ামন তখনি আত্মঘাতী হইবার জন্য যেন খুব ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

রাজা কি আর করেন? হাজার হোক চূড়ামন হইলেন রাজ্যের মন্ত্রী—সব কাজে তাঁর ডান হাত। তাব পর আবার জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহাকে কি তিনি আত্মঘাতী হইতে দিতে পারেন? মন্ত্রীকে ঠাণ্ডা করিয়া রাজা হুকুম দিলেন—'আচ্ছা, আসুক শের শার মেয়েছেলেবা আমার কেল্লায়—আমি তাদের আশ্রয় দিলাম।'

শের শা খবর শুনিয়া তো খুব খুশী। মনে মনে বলিলেন—'এইবার দেখা যাবে দুর্গে কে কা'কে আশ্রয় দেয়। এখানকার রাজাও যেমন রাজা-নামের কলঙ্ক, তার মন্ত্রীও তাই। রাজাটা হচ্ছে মহা খামখেয়ালী, কথা দিয়ে কথা রাখে না। আর মন্ত্রী হচ্ছে ঘুষখোর—পয়সার গোলাম—পয়সার জন্যে না করতে পারে এমন কাজ দুনিয়ায় নেই। এ দুজনকেই দুর্গ থেকে সরিয়ে এখানে গ্যাঁট হয়ে বসতে হচ্ছে।'

মনের ভাব মনে চাপিয়া শের শা রাজাকে ধন্যবাদ জানাইয়া পত্র লিখিলেন। তার পর এক এক করিয়া রোটাসগড়ে ডুলি পাঠাইতে লাগিলেন। ডুলির পর ডুলি, তার পর ডুলি—বার-শ ডুলি সারবন্দী হইয়া চলিল রাজার কেল্লায়।

শের শা কি করিয়াছেন জান? গোটাকয়েক ডুলির মধ্যে জনকয়েক বুড়ীকে পূরিয়াছেন। আর বাকি সবগুলোতে পূরিয়াছেন—লড়াইওয়ালা ভাল ভাল পাঠান যোদ্ধা। এক একটা ডুলিতে দুই দুইজন পাঠান। কিন্তু মজা এই, তাদের দাড়ি-গোঁপ কামানো, মুখে মেয়েদের মত ঘোমটা—দেখিতে একেবারে হুবহু মেয়েছেলে! ডুলির ভিতর অস্ত্রশস্ত্রও লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। সবার আগে চলিল সেই ডুলি কয়টা—যাতে ছিল সত্যিকার বুড়ীরা। ডুলি কেল্লার ফটকের কাছে পৌঁছিতেই, সান্ত্রী-পাহারা হাঁকিল—'ডুলির ভেতর কি আছে আগে দেখাও, তার পর কেল্লায় ঢোকো।'

সান্ত্রী তখন একটির পর একটি করিয়া ডুলি পরীক্ষা করিতে সুরু করিল।

শের শা দেখিলেন, তাই তো, সান্ত্রী ব্যাটা যদি এমনি করিয়া একে একে সব ডুলি দেখিতে চায়, তবেই তো গোল! সব মতলবই যে ফাঁসিয়া যাইবে! তিনি ডুলি পাঠানো বন্ধ করিয়া রাজাকে লিখিলেন—'মুসলমানের মেয়েছেলেকে কারও

সামনে বেরুতে নেই, এ কথা নিশ্চয়ই আপনি জানেন। কিন্তু কি লজ্জা, কি অপমানের কথা, একজন ভুট্টাখেগো খোট্টা কিনা ডুলি পরীক্ষা করে—জানানাদের মুখ দেখে! আপনি এখনি এর প্রতিকার করুন; না করলে, আর আমি মেয়েদের কেল্লায় পাঠাব না।'

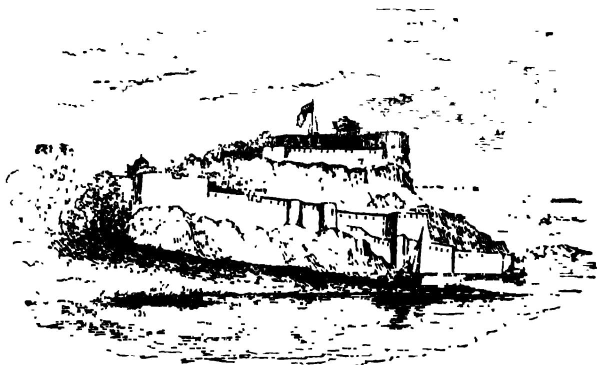
রাজা ভাবিলেন, কাজটা সত্যসত্যই ভাল হয় নাই। তিনি তখনই সান্ত্রী-পাহারাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—'খবরদার, আর যেন ডুলির কাপড় খুলে দেখা না হয়।'

শের শা তো এই সুযোগই এতক্ষণ খুঁজিতেছিলেন। তিনি একে একে বার-শ ডুলি রোটাসগড়ে পাঠাইলেন। তার পর আর যায় কোথা! কেল্লায় ঢুকিয়াই গোঁপদাড়ি-কামানো যোদ্ধারা মেয়েছেলেদের সাজপোশাক ছাড়িয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যে যার ডুলি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। দুর্গের ভিতর মহা হৈচৈ পড়িয়া গেল।

শের শাও কেল্লার বাইরে লোকজন লইয়া লুকাইয়াছিলেন, তিনি সুযোগ বুঝিয়া হুড়মুড় করিয়া কেল্লায় ঢুকিয়া পড়িলেন। তার পর মার্ মার্! কাট্ কাট্! ধর্ ধর্! দুর্গের লোকজনের কতক মরিল, কতক পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। রাজা বেগতিক দেখিয়া খিড়কির দরজা দিয়া দিলেন চম্পট! শের শা খুব সহজেই তখন রোটাসগড় ফতে করিলেন।

এদিকে চুনার-দুর্গ দখল করিয়া মোগলদের বাদশা হুমায়ুন দেখিলেন, শের শার মত দুর্দ্দান্ত লোককে জব্দ করা সহজ কথা

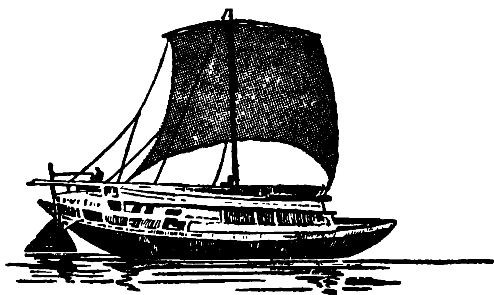
নয়। চুনার-দুর্গ তাহার গিয়াছে বটে, কিন্তু সেই ফাঁকে সে তাহার চেয়েও বড় যে রোটাসগড়, সেটা দখল করিয়া বসিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, তাহার লোকজন ওদিকে বাংলার ধনরত্নও লুঠিয়া লইতেছে। বাদশা ঠিক করিলেন, আগে সোনার বাংলাকে বাঁচাই, তাহার পর ধূর্ত্ত শেরের সঙ্গে বুঝাপড়া। কিন্তু তিনি বাংলায় গিয়া দেখিলেন, সেখানকার অগুনতি ধনদৌলৎ শেরের লোকেরা লুঠিয়া বেমালুম সরিয়া পড়িয়াছে। ফিরিবার পথেও তিনি শেরের কিছু করিতে



চুনার-দুর্গ

পারিলেন না; তাহাকে জব্দ করিতে গিয়া তাঁহার হাতে এমনি জব্দ হইলেন যে কোন রকমে প্রাণটা বাঁচিল।

শের শার সঙ্গে মোগলেরা আর কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। মোগলদের পরাস্ত করিয়া শের আগ্রার বাদশাহী সিংহাসনে বসিয়া এ দেশে আর একবার পাঠান-শাসন চালাইয়াছিলেন। সে অনেক কথা, খতাইয়া লিখিলে একখানা মোটা বই হয়। শের শার জীবনের সেই সব আশ্চর্য্য কথা তোমরা বড় হইলে জানিতে পারিবে।





মোগলদের বাদশা হুমায়ূনকে দেশছাড়া করিয়া পাঠানদের সর্দ্দার শের শা দিল্লীর সিংহাসনে গ্যাঁট হইয়া বসিয়াছেন বটে, কিন্তু মনে তাঁহার সুখ নাই। তাঁহারই রাজধানী দিল্লীর পঁচিশ ক্রোশ দূরে রাজা মালদেবের মস্তবড় রাজ্য। সে রাজ্যে পৎ পৎ করিয়া উড়ে স্বাধীনতার নিশান! তাহার উপর আবার মালদেব তাঁহাকে দেখিতে পারেন না—সুবিধা পাইলেই শত্রুতা করেন। দিল্লীশ্বর হইয়া শের শার কি তাহা বরদাস্ত হয়? তিনি ভাবিলেন, মারওয়াড় দখল করিতে না পারিলে কিসের তিনি দিল্লীশ্বর? অগুনতি সেনাসামন্ত, গুলিগোলা, হাতীঘোড়া, রসদ লইয়া চলিলেন—মালদেবের মারওয়াড় রাজ্যটা দখল করিতে।

মালদেবের রাজ্যে মাথা গলানো বড় শক্ত। সে রাজ্যের চারি দিকেই মজবুত কেল্লা। তবে একটা দিকে তেমন বেশী কেল্লা নাই। কিন্তু সেদিক দিয়া যাওয়া ভারি শক্ত। হোক শক্ত, শের শা মরুভূমির তপ্ত বালি ঠেলিয়া, এখানটা সেখানটা দখল করিতে করিতে শেষে মেরতায় গিয়া হাজির। এই

মের্‌তা ছাড়াইতে পারিলেই মারওয়াড় রাজ্যে ঢোকা সহজ। কিন্তু সেখানে গিয়া শের শা যাহা দেখিলেন, তাহাতে তো তাঁহার আক্কেল গুড়ুম! সারি সারি রাজপুতদের তাঁবু। মালদেবের সৈন্যেরা গিস্‌গিস্‌ করিতেছে। অনেকে ঘাঁটি আগলাইয়া বসিয়া আছে। ঢিলটি মারিলেই পাটকেলটি খাইতে হইবে।

শের শা রাজপুত জাতিকে চিনিতেন। মালব-দখলের সময় তিনি রাজপুতের অস্ত্রের ধার ভাল রকমই পরখ করিয়াছেন। তাহারা যোদ্ধার জাত—যুদ্ধেব নাম শুনিলেই বুকটা তাহাদের আনন্দে ফুলিয়া উঠে। সাহস, গায়ের জোর, আর কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতায় রাজপুত-ঘোড়সওয়ারের কাছে মোগল-পাঠান কেউ কিছুই নয়। সেই রাজপুত-



সারি সারি রাজপুতদের তাঁবু

জাতের পঞ্চাশ হাজার ঘোড়সওয়ার যুদ্ধের জন্য খাড়া। শের শা তো আর বোকা লোক নন। তিনি দেখিলেন—শত্রু সজাগ, তা ছাড়া দলেও ভারী; এ অবস্থায় উপরচড়া হইয়া লড়িতে যাওয়া বোকামি। তবে তাঁহার সুবিধা হয়, যদি

রাজপুতেরা নিজেদের কোট হইতে বাহির হইয়া আসিয়া লড়াই করে। কিন্তু দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, তবুও রাজপুতদের কোন গরজ দেখা গেল না। শের শা পড়িলেন মহা মুশকিলে। এই মরুভূমির দেশে সৈন্যদের আহার মেলা ভার। এখানে মেলে অতি কষ্টে গমের মত এক রকম জিনিস—নাম বাজ্‌রা, তাহা দিয়া রুটি করা যায়। কাজেই বেশী দিন এই মরুভূমির দেশে থাকিতে হইলে দিল্লী বা আর কোথাও হইতে রসদ না আনাইলে চলে না। কিন্তু যুদ্ধ করিতে আসিয়া ফিরিয়া যাওয়াও তাঁহার মত লোকের পক্ষে বড় লজ্জা, বড় অপমানের কথা। এমন অবস্থায় কি করা যায়!—বসিয়া বসিয়া শের শা মাথা ঘামাইতে লাগিলেন। যেখানে গায়ের জোরে সুবিধা করা যায় না, সেখানে মুসলমান বীরেরা অনেক সময় বুদ্ধির জোরেই কেল্লা ফতে করিয়া থাকেন। মাসখানেক বসিয়া থাকিবার পর শের শা তাই মনে মনে বলিলেন—'বটে, ভেবেছ আমার ধনুকে শুধু একটা ছিলে? না বন্ধু, তা নয়। লড়াই না ক'রেও যাতে তোমাকে আমি ঘায়েল করতে পারি তার ব্যবস্থা করছি।'

শের শা তাহার পর কি করিলেন জান? খস্‌খস্‌ করিয়া কি একখানা চিঠি লিখিলেন। এই চিঠিখানা একজন বিশ্বাসী লোককে দিয়া এমন জায়গায় ফেলিয়া রাখা হইল যেন মালদেবের মন্ত্রী তাঁবুতে ফিরিবার সময় উহা দেখিতে পান।

মন্ত্রী-মশাই পথে সেই চিঠি কুড়াইয়া পাইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন, তাহার পর খুব গোপনে লইয়া গিয়া দিলেন রাজার হাতে।

হাতের কাছে শিকার জুটিলে শিকারীব পক্ষে যেমন হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব, বাড়ীর কাছে শত্রুর ঘাঁটি দেখিয়াও যুদ্ধ না করিয়া থাকা রাজপুত বীরদের তেমনি অসহ্য হইয়াছিল। তাঁহারা এই কারণে রাজাকে তাঁহাদের মনের কথাটা খুলিয়া বলিবার জন্য একদিন সন্ধ্যার পর রাজসভায় গিয়া হাজির হইলেন; কিন্তু দেখেন, রাজার মুখে কথা নাই, তিনি বড় বেজার, বড় গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছেন। বীরেরা রাজাকে তাতাইবার জন্য যুদ্ধের কথা পাড়িলেন, শত্রুর যুদ্ধের সাধ কেমন করিয়া মিটাইবেন, তাহার কথা বলিলেন। কিন্তু রাজার মুখে এতটুকু উৎসাহেব চিহ্ন দেখা গেল না। তাঁহাবা অবাক হইয়া কারণ জানিতে চাহিলেন।

রাজা কথা কহিলেন না, একটু শুক্‌নো হাসি হাসিয়া একখানা চিঠি সভার মাঝে ফেলিয়া দিলেন। একজন রাজপুত সর্দ্দার—নাম তাঁহার কুম্ভ, তাড়াতাড়ি চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে রাগে তাঁহার চোখের ভুরু কুঁচকাইয়া যাইতে লাগিল। শের শা মালদেবকে ঠকাইবার জন্য যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, এ সেই চিঠি। চিঠিতে মালদেবের সর্দ্দাররা যেন শের শাকে লিখিয়াছেন—'আমরা কেউ রাজা মালদেবেব উপব খুশী নই।

খুশী না হইবার অনেক কারণ। আপনি যদি আমাদের অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন—খুশী করিবেন বলিয়া কথা দেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার মিত্র না হইয়া শত্রু হইব, আর যুদ্ধ বাধিলেই মালদেবকে ধরিয়া আপনার হাতে সঁপিয়া দিব। আপনি তাঁহাকে যেমন খুশী সাজা দিবেন।'—এই চিঠিখানা পাইবার পর শের শা যেন সর্দ্দারদের কথায় রাজী আছেন বলিয়া মন্তব্য করিয়া নামের সহি দিয়াছেন।

চিঠিখানা পড়া হইলে মালদেবের সর্দ্দাররা কত দিব্যি গালিয়া রাজাকে বুঝাইতে চাহিলেন যে, এ চিঠি তাঁহারা কেহই শের শাকে লেখেন নাই—এমন নিমকহারামি তাঁহারা কখনই করিতে পারেন না। নিশ্চয়ই এটা ধূর্ত্ত শের শার কারসাজি!

কিন্তু ইহাতে ফল হইল ঠিক উল্টা। মালদেব ভাবিলেন, নিশ্চয়ই ইহা সর্দ্দারদের কাজ—এখন ধরা পড়িয়া সাফাই গাহিতেছে। এই জন্যই বুঝি সর্দ্দাররা শের শার সঙ্গে তাড়াতাড়ি লড়াই করিবার জন্য এত ব্যস্ত! রাজা তাহাদের ধিক্কার দিয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

সর্দ্দারদের মধ্যে কুম্ভ—যিনি চিঠিখানা সকলকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, বলিলেন,—'শের শার চাতুরীতে মহারাজ আমাদের অবিশ্বাস করলেন, এর চেয়ে দুঃখের কথা আমাদের আর কিছুই নেই। এ অবিশ্বাস যদি আমরা দূর করতে না পারি, তবে বৃথাই আমাদের বেঁচে থাকা, বৃথাই আমাদের

জাতির গৌরব। এস, আমরা শত্রুর সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রে তার চাতুরীর উপযুক্ত প্রতিফল দিই। শত্রুর বুকের রক্তের ধারায় রাজার মনের অবিশ্বাসের ছাপ ধুয়ে ফেলি।' সর্দ্দাররা সকলেই উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়া কুম্ভের কথায় সায় দিলেন।

কিন্তু রাজা শের শার চালাকিতে ভড়কাইয়া গিয়াছিলেন, কিছুতেই তাঁহার মন স্থির হইল না। তিনি গভীর রাত্রে চুপি চুপি যোধপুরের দিকে চোরের মত সরিয়া পড়িলেন।

পরের দিন পাখীর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে বারো হাজার রাজপুত-ঘোড়সওয়ার ঝড়ের বেগে শের শার তাঁবুর উপর গিয়া পড়িল। আজ তাহারা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে,—হয় মরিবে, নয় শত্রুকে শিক্ষা দিবে। তাহাদের আক্রমণের তোড়ে শের শার ছাউনি লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। সৈন্যেরা কে কোন্‌দিকে ছুটিয়া পলাইবে ভাবিয়া পাইল না। আর খানিকটা এই ভাবে যুদ্ধ চলিলে শের শার পক্ষে তাল সামলানো দায় হইয়া উঠিত। কিন্তু রাজপুতেরা একটা বড় ভুল করিয়া বসিল, তাহারা সকলে ঘোড়া হইতে নামিয়া বর্শা-হাতে শত্রুকে তাড়া করিল।

শের শার কড়া হুকুম ছিল, তাঁহার সৈন্যেরা যেন ঢাল-তলোয়ার লইয়া রাজপুতদের সঙ্গে লড়িতে না যায়। গেলে আর তাহাদের নিষ্কৃতি নাই। শের শা সুবিধা পাইয়া এইবার হুকুম দিলেন—'চালাও হাতী রাজপুতদের ওপর দিয়ে! পিষে ফেলো দুশমনদের হাতীর পায়ের তলায়।'

তখন কিল্‌কিল্‌ করিয়া শের শার হাতী বাহির হইয়া রাজপুত-বীরদের উপর গিয়া পড়িল। হাতীর পিছন হইতে শেরের গোলন্দাজেরা অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল, তীরন্দাজেরা তাক করিয়া তীর ছুঁড়িতে লাগিল। কিন্তু সেদিন রাজপুতদের পণ ছিল—হয় মৃত্যু, না হয় শত্রুনাশ ; সম্মুখে মৃত্যু দেখিয়াও তাহাদের কেহ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল না। আশ্চর্য্য বীরত্ব দেখাইয়া, অগুনতি শত্রু বধ করিয়া, তাহারা একে একে যুদ্ধক্ষেত্রে দেহ রাখিল।

এই যুদ্ধে যে শের শার জয় হইয়াছিল, তাহা সত্য ; আর তিনি যে রাঠোর-রাজপুতদের হাত হইতে মারওয়াড় কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহাও মিথ্যা নয়। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহার এত সৈন্য ক্ষয় হইয়াছিল, তাঁহাকে এত বেশী বেগ পাইতে হইয়াছিল যে, মারওয়াড়ের যুদ্ধের কথা তিনি খুব ভয়ে ভয়ে স্মরণ করিতেন, আর মুখেও বলিতেন—'ওঃ, ঠিকে আমার কি ভুলই হইয়াছিল ! এক মুঠা বাজ্‌রার লোভে আমি হিন্দুস্থানের অত-বড় রাজ্যটা খোয়াইতে বসিয়াছিলাম !'





মান বড়, না, প্রাণ বড়?

গোণ্ডোয়ানা একটি ছোট্ট দেশ। ভারতবর্ষের মাঝখানে একটি পর্ব্বতশ্রেণী আছে, নাম তার বিন্ধ্যাচল। এই পাহাড়ের কোলেই মধ্যপ্রদেশ। ইহারই উত্তর-পূর্ব্ব অংশে গোণ্ডোয়ানা রাজ্য।

সাড়ে চার-শো বছর আগে এক রাজপুত-রাণী এইখানে রাজত্ব করিতেন। নাম তাঁর দুর্গাবতী। রাজপুতেরা যোদ্ধার জাত। যত-বড় বীর, আর যত-বড় রাজা-বাদশাই হোন না কেন, যুদ্ধ করিতে আসিলে তখনই রাজপুতেরা বুক ঠুকিয়া সাম্‌নে আসিয়া খাড়া হইত—প্রাণের ভয়ে পিছন ফিরিত না। শুধু যে পুরুষেরাই লড়াই করিতে জানিত, যুদ্ধবিদ্যা শিখিত,—

আর মেয়েরা কুটনো-কোটা, বাটনা-বাটা লইয়াই থাকিত, তা নয়,—তাহারাও অনেকে পুরুষের সঙ্গে সমানে সমানে যুদ্ধ চালাইতে পারিত। রাণী দুর্গাবতীও তেম্‌নি এক রাজপুত-মেয়ে। শোনা যায়, তাঁর তীরের তাক একটুও এদিক-ওদিক হইত না ; যেখানটায় তাক করিয়া তীর ছুঁড়িতেন, তীর গিয়া ঠিক সেইখানে বিঁধিত। এম্‌নি করিয়া তিনি কত বাঘ, কত শূয়ার, আর কত যে হরিণ মারিয়াছেন, তার ঠিক নাই।

আগে অবশ্য রাজা দলপৎই দেশ-শাসন করিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর পাঁচ বছরের ছেলে বীরনারায়ণের আর রাজ্যের ভার রাণীর উপর পড়িল। এই ছেলে আর স্বামীর রাজ্য, দুই-ই তাঁর কাছে সমান আদরের জিনিস। আর অধর নামে একটি পুরনো আমলাকেও তিনি খুব ভালবাসিতেন। লোকটি জাতিতে কায়স্থ, খুব বিশ্বাসী আর বুদ্ধিমান্‌। তিনিই ছিলেন—রাণীর সকল কাজে ডান হাত।

রাণী স্নেহে যত্নে ছেলেকে মানুষ করিয়া তুলিতে লাগিলেন ; সুশাসনে আর সুব্যবস্থায় দেশের যত দূর সম্ভব উন্নতি করিলেন।

সত্তর হাজার গ্রাম লইয়া রাণীর এই রাজ্য। তাঁর হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া গিজ্‌গিজ্‌ করে। লড়াইয়ের হাতীই হাজারখানেক, লড়াইয়ের ঘোড়াও বিশ হাজারের কম নয়। ঘরে ধনদৌলৎ, জিনিসপত্রও তেম্‌নি। এমন সোনার রাজ্য আর রাজধানীর উপর লোভ না হয়

কা'র ? ভাঙিয়া-চুরিয়া লুঠিয়া লইতে পারিলে যে পোয়া-বারো।

মালব-রাজ্যটা গোণ্ডোয়ানা-রাজ্যের পাশেই। রাণীর রাজ্যের উপর মালবের রাজা বাজ্-বাহাদুরের যেমন লোভ, তেম্নি হিংসা। খুব জাঁক করিয়া তিনি লড়াই বাধাইলেন। আশপাশের মীয়ানা আফগানেরাও কোমর বাঁধিয়া যুদ্ধে নামিল। কিন্তু রাণীর তীরের মুখে কেহই দাঁড়াইতে পারিল না;—প্রাণ লইয়া পলাইল। শুধু একবার নয়, অনেকবার এমন হইয়াছে।

তখন আকবর বাদশার আমল। যেখানে যত স্বাধীন রাজ্য ছিল, সব দখল করিয়া গোটা ভারতেই বেপরোয়া মোগল-শাসন চালাইবেন, ইহাই তাঁহার মতলব। তাই যেখানে যত ভাল লোক পাইয়াছেন,—কি হিন্দু, কি মুসলমান—সব হাত করিয়াছেন। তাদের কেহ উজীর, কেহ নাজির, কেহ সেনাপতি, কেহ কোটাল। রাজ্যের কোনোদিকে ব্যবস্থার কসুর নাই। সেনা আর সেনাপতিরা যে নাকে তেল দিয়া ঘুমাইবেন, আর মাসের মাস মাহিনা লইবেন, সেটি হইবার জো নাই। মাহিনা লও, যুদ্ধ করো। 'যুদ্ধ না করিলে, বসিয়া বসিয়া ঝিমাইলে, আশপাশের রাজারা তলোয়ারের খোঁচায় কুড়েমির ঘোর ছুটাইয়া দিবে'—ইহাই ছিল তাঁহার বুলি। কাজেই বাদশার সেনা-সামন্তকে সকল সময় যুদ্ধের জন্য তৈরি থাকিতে হইত।

কিছু দিনের মধ্যেই বাদশার সৈন্যেরা এদেশ-সেদেশ জয় করিয়া মালবের সৈন্যের সঙ্গে লড়াই বাধাইল। মালব কতটুকুই বা রাজ্য, আর তার সৈন্যই বা কত! বাদশার সৈন্যেরা দেখিতে দেখিতে রাজাকে হারাইয়া দিয়া, তাঁর রাজ্যটি কাড়িয়া লইল আর জয়ধ্বনিতে আকাশ কাঁপাইয়া তুলিল।

মালব, আর গোণ্ডোয়ানা গায় গায় লাগাও। এ-রাজ্যে ওড়ে বাদশার নিশান, ও-রাজ্যে তার পাশেই ওড়ে রাণীর নিশান—স্বাধীন রাজ্যের নিশানা! বাদশার এলাকার পাশে গোণ্ডোয়ানা রাজ্য তো সাগরে শিশির-বিন্দু; সে আলাদা হইয়া, বাদশার রাজ্যের তোয়াক্কা না রাখিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া থাকিবে, এও কি সহ্য করা যায়? বাদশার সেনাপতি আসফ খাঁ রাগের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কাঁচা লোক ন'ন; রাণীর বীরত্বের কথা তাঁর বেশ ভাল রকমই জানা-শোনা ছিল; তাই ফস্‌ করিয়া রাজধানীর দিকে হাত বাড়াইলেন না। প্রথমে জুলুম আরম্ভ করিলেন রাজ্যের সীমানার দিকে। সেখানকার লোকেরা লুঠপাট আর অত্যাচারের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিল। এই অঞ্চলেই রাণীর বেশীর ভাগ সৈন্যের বাস। তাহারা মোগলদের হাত হইতে পুঁজিপাটা, আর স্ত্রীপুত্রদের মান-ইজ্জৎ বাঁচাইবার জন্য, যেখানে পারিল ছুটিয়া পলাইল। এইরূপে কাজ অনেকটা হালকা হইলে আসফ খাঁ রাণীর দরজার গোড়ায় আসিয়া খুব জোরে ডঙ্কা মারিলেন।

রাণী দুর্গাবতী রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি ভয় পাইবার মেয়ে ন'ন; তাঁর বাপের নাম শালিবাহন—কুলে-মানে যিনি পাহাড়ের সমান উঁচু। স্বামী তাঁর বীর; তাঁর মৃত্যুর পর, এই রাজ্যটাকে রাণী যকের ধনের মত আগলাইয়া বসিয়া আছেন,—এক হাতে তীর-ধনুক, আর এক হাতে দণ্ড। স্বামীর জন্য চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়াছে, শোকে প্রাণ হু হু করিয়াছে, কিন্তু তিনি কাঁদিতেও পারেন নাই, শোক করিতেও পারেন নাই—চোখের জল চোখে শুকাইয়াছে, প্রাণের শোক প্রাণে মিলাইয়াছে, তাঁহাকে রাজ্যের দিকে ফিরিয়া চাহিতে হইয়াছে। প্রাণের চেয়ে বড় এই রাজ্য, তার উপর জুলুম, আবার দরজার গোড়ায় আসিয়া ডঙ্কা! ধিক্ দুর্গাবতীর জীবনে, ধিক্ তাঁর তীর-ধনুকে, আব শত ধিক্ তাঁর রাজত্বে! রাণী যুদ্ধের জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু অধর লোকটা ভারি ঠাণ্ডা মেজাজের; তাঁর রাজ্যের উপর যেমন মায়া, রাণীর উপরও তেম্‌নি। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, কাজটা মোটেই ভাল হইতেছে না। তীর-ধনুকে রাণীর হাত যত সাফাই হোক না কেন, কোথায় বা দিল্লীর বাদশা, আর কোথায় বা গোণ্ডোয়ানার রাণী—আস্‌মান্-জমিন্ তফাত বলিলেই হয়। বাদশার সঙ্গে লড়াইও যা, আর তাঁর লোকের সঙ্গে লড়াইও তা। আসফ খাঁর যদি একটা লোক মরে, তখনই দশটা লোক আসিয়া তার জায়গায় খাড়া হইবে। তাঁর কি লোকের অভাব আছে, না, অস্ত্রের অভাব আছে?

অধর রাণীর কাছে আসিয়া হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "মা, কাজ নাই, রফা করো। আসফ খাঁর সঙ্গে লড়িতে হইলে অনেক সৈন্য, অনেক কাঠখড় চাই; কিন্তু তোমার সে-সব কুই? মোগলের ভয়ে সৈন্যেরা মুলুক ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কুড়াইয়া-বাড়াইয়া বড়জোর পাঁচ-শো সৈন্য তুমি পাইতে পার। এত কম সৈন্য লইয়া আসফ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা চলে কি? যদি হুকুম করো, খাঁ-সাহেবকে বলিয়া-কহিয়া আপোস—"

রাণী আগুনের মত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন,—"আপোস! কা'র সঙ্গে!—আসফের সঙ্গে! খোদ বাদশার সঙ্গে হইলেও না হয় কথা ছিল! কোথাকার কে একজন ক্ষুদে সেনাপতি! আব সেনাপতিই বা কে বলে তাকে—ডাকাতের সর্দ্দার, দুর্ব্বলের উপর জুলুম করাই যার কাজ, তার সঙ্গে আপোস! অধর, নিশ্চয় তোমার মাথা খারাপ হইয়াছে।"

অধর দেখিলেন, কিছুতেই কিছু হইবার নয়, একটি সৈন্য না পাইলেও রাণী যুদ্ধ করিবেন। এ যুদ্ধের যে কি ফল হইবে, তাহাই ভাবিয়া তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

রাণী দুর্গাবতীও অবুঝ মেয়ে ন'ন; মোগলের লোকবলের বিপক্ষে দাঁড়ানো যে কি বিপদের কথা, তাহা তিনি বেশ জানিতেন। কিন্তু মান আর দেশের স্বাধীনতাই ছিল তাঁর কাছে সকলের বড়। আসফের সঙ্গে আপোস করার

মানে,—তার কাছে খাটো হওয়া, আর মোগলের শাসন মানিয়া লওয়া। দুর্গাবতীর পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব।

উপস্থিত-মত হাজার-দুই সৈন্য পাওয়া গেল। রাণী ইহাদের লইয়াই যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত; কিন্তু কর্ম্মচারীরা অনেক করিয়া বুঝাইল যে, আরও সৈন্য পাওয়া যাইতে পারে; যত দিন না পাওয়া যায়, নর্হীতে গিয়া থাকাই ভাল। নর্হী বনজঙ্গলে-ঘেরা একটা জায়গা, তাই দুই পাশে খাড়া পাহাড়। রাণী কর্ম্মচারীদের কথায় অমত করিলেন না।

খবর পাইয়া মোগলরাও 'দিন্ দিন্' শব্দে হল্লা করিতে করিতে সেই দিকে ছুটিল। নর্হীতে রাণীর আরও কিছু সৈন্য বাড়িল। তিনি সৈন্যদের ডাকিয়া বলিলেন, "দেশের জন্য প্রাণ দিতে হইবে বলিয়া আমি তোমাদের ডাকিয়াছি; যাহাদের প্রাণের ভয় আছে, তাহারা এই বেলা সরিয়া পড়। আমি শত্রুর ভয়ে এমন করিয়া আর চোরের মত লুকাইয়া থাকিতে পারিব না। যুদ্ধ করিব, কত জন যুদ্ধে প্রাণ দিতে পারিবে বলো?"

একসঙ্গে পাঁচ হাজার সৈন্য গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "প্রাণ দিব—সবাই আমরা দেশের জন্য প্রাণ দিব—জয় মা দুর্গাবতীর!" সেই গর্জ্জনে নির্জ্জীব পাহাড়গুলাও যেন সজীব হইয়া গম্ভীর আওয়াজ দিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দুই দলে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

পরদিন রাণীর কাছে খবর আসিল, বড় ভয়ের কথা—মোগলরা অনেক চেষ্টার পর পাহাড়ের মুখটা দখল করিয়াছে! রাণী সৈন্যদের ভরসা দিয়া বলিলেন, "কোনো ভয় নাই; দেখ না, এখনই আমি উহাদের কি দশা করি।"—বলিয়া তিনি নিজে যুদ্ধের জন্য তৈরি হইলেন, আর এমনি কৌশলে সৈন্য চালাইলেন যে, মোগলেব বেশীর ভাগ সৈন্যই পাহাড়ের পথে ঢুকিয়া প্রাণ হারাইল; বাদবাকি সৈন্যেরা কোনোরূপে পলাইয়া বাঁচিল। বাণীর সৈন্যদের তখন ভারি ফুর্ত্তি, তাহারা রাণীর নামের জয়ধ্বনি দিয়া পাহাড় কাঁপাইতে লাগিল। বাণীর মুখে কিন্তু তেমন খুশীর ভাব দেখা গেল না; তিনি বলিলেন, "শত্রু হারিয়াছে সত্য, তবে এই হারই তাহাদের শেষ হার নয়। তাহাদের অনেক সৈন্য এখনও বাঁচিয়া আছে, তাহারা এদিক-ওদিক হইতে আরও সৈন্য আনিয়া দল ভারী করিবে। তার পর আবার লড়াই। যদি শত্রুর হাত হইতে বাঁচিতে চাও, তাহা হইলে এস, এখনই আমরা উহাদের পিছন-পিছন ছুটি,—ফের যুদ্ধের জন্য তৈরি হইবার আগেই উহাদের সব-ক'টাকে সাবাড় করি।"

সৈন্যেরা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যুদ্ধ করিয়া তাহারা বড় হয়রান হইয়াছে, তাহাদের এখন আর যুদ্ধ কবিবার ইচ্ছা নাই। রাণী মনের ভাব বুঝিয়া যুদ্ধের স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। যে-সব সৈন্য জখম হইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল, তাহাদের সেবা করিতে লাগিলেন, আর

যাহারা মারা গিয়াছে, তাহাদের আত্মীয়স্বজনকে সান্ত্বনা দিলেন। সারা রাত এমনি করিয়া কাটিল।

দুর্গাবতী যে-ভয় করিয়াছিলেন, তাহা ফলিতে বড় বেশী দেরি হইল না। ভোরে পাখীর ডাকে সৈন্যদের ঘুম ভাঙিল না; ভাঙিল—মোগলের কামানের ডাকে। আসফ খাঁ বাদশার সেনাপতি, কত বড়-বড় যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি দরবারে মান পাইয়াছেন; একজন স্ত্রীলোকের কাছে হার! এ অপমান কি তিনি সহ্য করিতে পারেন? দলে ভারী হইয়া, ভাল ভাল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, ভোর হইবার আগেই তিনি পাহাড়ের মুখে আসিয়া কামান দাগিলেন—গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্!

যুদ্ধ—আবার যুদ্ধ। আবার সেই তীরের শন্‌শন্, গুলির বন্‌বন্, তলোয়ারের ঝন্‌ঝন্, আর থাকিয়া থাকিয়া কামানের গর্জ্জন! কাটাকাটি, মারামারি, লাফালাফিতে পাহাড়ে দেশটা যেন ওলট্‌পালট্ হইতে লাগিল।

এত যে তীর, এত যে গুলির বৃষ্টি—রাণীর কোনোদিকেই খেয়াল নাই; হাতীতে চড়িয়া নির্ভাবনায় যুদ্ধ করিতেছেন। ডঙ্কা বাজিতেছে, আর তালে তালে হাতী নাচিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে রাণীর পিঠে তূণ উঠিতেছে পড়িতেছে, বেণী দুলিতেছে, মাথার মুকুটে মণি ঝলকাইতেছে, তাঁহার ধনুক হইতে যেন মুহুর্মুহু অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে। যেদিকে তাহা পড়িতেছে, সেদিকে কেবল 'সামাল সামাল' রব।

আজ যে শুধু রাণীই যুদ্ধে আসিয়াছেন, তা নয়—পুত্র বীরনারায়ণও আসিয়াছে। যেমন মা, তেমনি ছেলে। সে যেদিকে হানা দেয়, সেদিকে যেন একটা বিষম ঝড় ওঠে। মোগলরা মরিয়া হইয়া তাঁহাকে মারিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একে একে দুই বার বীরনারায়ণ তাহাদের ধাক্কা সামলাইল। তিন বারের বার আর পারিয়া উঠিল না—জখম হইল। ইহাতে বিপক্ষের খুব সুবিধা হইয়া গেল। যাহারা বীরনারায়ণের সঙ্গে থাকিয়া লড়াই করিতেছিল, তাহাদের অনেকেই ভয় পাইয়া পলাইল। রাণীর পক্ষে তখন মোটে শ-তিনেক সৈন্য। তিনি ছেলেকে যুদ্ধস্থল হইতে সরাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়া, এই অল্প সৈন্য লইয়াই মোগলের সঙ্গে যুঝিতে লাগিলেন। আর জয়ের কোনো আশা নাই, এখন তো শুধু মরিবার জন্যই যুদ্ধ। রাণী ভাবিলেন, যখন মরিতেই হইবে,—অমনি কেন মরি? যত পারি শত্রু মারিয়া তবে মরি। অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছেন, তীর আর গুলি বিঁধিয়া দেহের নানা স্থান হইতে রক্ত ঝরিতেছে, রাণী ভুলিয়াও দেখিতেছেন না। এবার আর তীর-ধনুক নয়, এক প্রকাণ্ড বর্শা ডান হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া তিনি মোগল-সৈন্যের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বর্শার আঘাতে অনেকে মরিল, অনেকে জখম হইল। মোগলের পক্ষে সাম্‌না-সাম্‌নি যুদ্ধ চালানো শক্ত হইয়া উঠিল। দূর হইতে বাছা-বাছা তীরন্দাজ রাণীকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িতে লাগিল। একটা

তীর সাঁ করিয়া আসিয়া তাঁহার কপালে বিঁধিল, তিনি সেটি টানিয়া বাহির করিলেন। চোখে কিছুই দেখিবার উপায় নাই, ক্ষতস্থান হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিতেছে। সে রক্তে চোখমুখ ভাসিয়া যাইতেছে, পোশাক-আশাক সব লালে লাল। চোখের রক্ত মুছিতে না মুছিতে আর একটা তীর আসিয়া তাঁহার গলায় বিঁধিল। রাণী আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না—অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন।

জ্ঞান হইলে রাণী দেখিলেন, মোগল-সেনা সাগরের ঢেউয়ের মত নাচিতেছে, ফুলিতেছে, গর্জ্জাইতেছে। বর্শাটা খাড়া করিয়া ধরিয়া একবার উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন,—পারিলেন না। শরীরে কিছুমাত্র বল নাই, রক্তপাতে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। তবে এখন উপায়? মোগলরা যে এখনই তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিবে, আব শিকল দিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইবে! রাণী বড় হতাশ হইয়া, অধরের দিকে চাহিলেন। সুখেই বলো, দুঃখেই বলো, যুদ্ধেই বলো আর শান্তিতেই বলো, অধর তাঁহার পায়ের কাছে গরুড়-পক্ষীটির মত বসিয়া আছেন—যেন তাঁহার সাত জন্মের নিমকের দায়। কিন্তু অধব আজ শুধু চুপ করিয়া বসিয়া নাই,—মাহুত হইয়া হাতী চালাইতেছেন। মোগলের গোলাগুলি, তীর-বর্শার মধ্য দিয়া এমন কৌশলে হাতী চালাইতেছেন যে, রাণীকে কেহ ধরিতে-ছুঁইতেও পারিতেছে না।

বাণীর জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া অধর খুব খুশী হইলেন। তাঁহাকে তিনি আর এ অবস্থায় যুদ্ধস্থলে রাখিতে চান না—দূরে লইয়া গিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইতে চান। কিন্তু হুকুম না পাইলে তো যাইবার উপায় নাই; কহিলেন, "মা, এখন আর এখানে থাকিয়া কি হইবে? হুকুম করো, তোমাকে এখান হইতে সরাইয়া লইয়া যাই।"

বাণীর কানে একটি কথাও ঢুকিল না, বলিলেন, "বাবা, আমার একটা কাজ তোমাকে করিতেই হইবে। তোমাকে আমি বড় স্নেহে, বড় যত্নে মানুষ করিয়াছি। মানুষ আশাতেই সব করে। আমার মনে কি আশা ছিল জানো?—একদিন না একদিন দরকার হইবে, আর তোমার কাছে আমি একটা বড় কাজ পাইব। আজ আমার সেই দিন।"

অধর হুকুম পাইলে কি না-করিতে পারেন? বলিলেন, "হুকুম করো।"

অধরের কোমরে একখানা মস্ত বড় ছোরা ছিল। রাণী সেইটি দেখাইয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী বাপ আমার, ঐটি আমার বুকে বসাইয়া দাও। আমার মান বাঁচাও, নাম রাখো।"

রাণী মরিয়া মোগলের হাত হইতে রক্ষা পাইতে চান। কথা শুনিয়া অধরের গায়ে যেন কাঁটা দিয়া উঠিল। যিনি পেটে ধরেন, তিনিই কি শুধু মা? আর কেউ ন'ন? তবে যিনি সারাজীবন বুকের স্নেহ দিয়া ক্ষুধায় আহার, অসুখে সেবা, শোক-দুঃখে সান্ত্বনা দিয়া মানুষ করেন, তিনি কি?

তাঁরই বুকে ছোরা! অধর দাঁতে জিব কাটিয়া বলিলেন,—“মাপ করো মা, আমি ও-কাজ কিছুতেই করিতে পারিব না। আর যার কথা বলিবে, তার বুকেই আমি ছোরা মারিতে পারিব; এমন কি নিজের বুকেও আমি হাসিতে হাসিতে ছোরা বসাইতে পারি। কিন্তু তোমার বুকে!—না, সে আমি কিছুতেই পারিব না—মারিয়া ফেলিলেও না।”

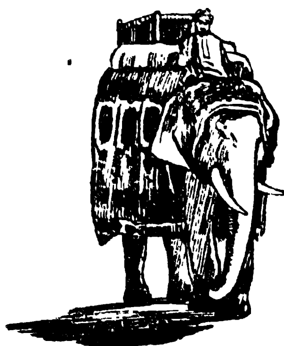
রাণী হতাশ হইয়া বলিলেন, “তবে মোগলরা আমাকে বাঁধিয়া লইয়া যায়, এই তোমার ইচ্ছা?”

অধর হাতীর মাথায় অঙ্কুশ মারিতে মারিতে কহিলেন, “বাঁধা অমনি মুখের কথা কি না! অধর বাঁচিয়া থাকিতে মোগল তো মোগল, যমেরও সাধ্য নাই, তার হাতীর দিকে এগোয়। ওদের বুকের ওপর দিয়ে হাতীসুদ্ধ তোমাকে আমি ঝড়ের বেগে উড়াইয়া লইয়া যাইব। শুধু তোমার হুকুমের অপেক্ষা।”

কথা শুনিয়া রাণী হাসিবেন কি কাঁদিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। এই অবুঝ লোকটা যে কেমন করিয়া তাঁহাকে বাঁচাইবে, কেবল সেই ভাবনা ভাবিয়াই সারা হইল; কিন্তু এত কাল সঙ্গে থাকিয়াও বুঝিতে পারিল না যে, যুদ্ধে হারিয়া পলাইয়া যাওয়ার চেয়ে রাজপুতের কাছে মৃত্যু হাজার গুণে ভাল। বলে কিনা ‘হুকুম করো, তোমাকে সরাইয়া লইয়া যাই!’

রাণী অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ অধরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তার পর ফস্ করিয়া তাহার কোমর হইতে ছোরাখানা কাড়িয়া লইয়া, প্রাণপণ জোরে নিজের বুকে বসাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে সব শেষ হইয়া গেল। তিনি মোগলকে ফাঁকি দিয়া আর অধরকে বোকা বানাইয়া, পৃথিবী হইতে বিদায় লইলেন।

এই যুদ্ধে মোগল যে জয়ী হইয়াছিল তাহা সত্য, কিন্তু রাণীর পরাজয়ের কাছে সে জয় যেন হার মানিয়া গেল। আসফের বাহাদুরির কথা কেহ আমলেই আনিল না; কিন্তু রাণীর কথা ঘরে ঘরে। প্রজারা তো কাঁদিয়াই আকুল, সত্যিকারের মা মরিলে মানুষ যেমন করিয়া কাঁদে, তাহারাও ঠিক তেমনি করিয়া কাঁদিল। আর কাঁদিল—ভারতের যেখানে যত স্বাধীন দেশ ছিল, তার লোকেরা; কেন না তিনি যে দেশের জন্য, দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিলেন!



চাঁদবিবি



রাণী দুর্গাবতীর রাজ্য ছিল ভারতবর্ষের মাঝখানে—গোণ্ডোয়ানায়; তাহারই দক্ষিণ দিকে, বোম্বাই শহর হইতে কিছু দূরে আমেদনগর নামে আর একটি রাজ্য আছে। সেই রাজ্যেও এক রাণী রাজত্ব করিতেন, নাম তাঁর চাঁদ সুলতানা। রাণী দুর্গাবতী ছিলেন হিন্দু,—ইনি মুসলমান। জ্ঞানে গুণে বীরত্বে তাঁহাদের কেউ কাহারও চেয়ে কম ছিলেন না; তাই একজনের কথা উঠিলেই আর একজনের কথা মনে পড়ে। রাণী দুর্গাবতীব সঙ্গে যেমন আকবর বাদশার লড়াই হয়, চাঁদ সুলতানার সঙ্গেও তাঁহার তেম্‌নি লড়াই হইয়াছিল। সেই লড়াইয়ের গল্পটাই আজ তোমাদের শুনাইতেছি; কিন্তু আগে লড়াইয়ের কারণটা জানিয়া রাখ।

আমেদনগরের রাজাদের ডাকনাম ছিল—নিজাম-শা। এই বংশের সুলতান ইব্রাহিম-শা মারা গেলে কে রাজা হইবে, এই লইয়া রাজ্যের মধ্যে বিষম ঘোঁট আরম্ভ হইল। একদল বলে অমুককে, আর একদল বলে তমুককে রাজা করা হোক।

এমন সময়ে কতকগুলা লোক একজোট হইয়া ইব্রাহিমের ছোট ছেলে বাহাদুর-শাকে সিংহাসনে বসাইল।

চাঁদবিবি ইব্রাহিমের পিসি। বাহাদুর ছিল তাঁহার প্রাণ। তাঁহার নিজের কোন ছেলে-মেয়ে ছিল না; তাই তিনি বুকের রক্ত দিয়া বাহাদুরকে মানুষ করিতেছিলেন। চাঁদবিবি স্ত্রীলোক হইলেও বুদ্ধি-বিবেচনায়, সাহসে-বীরত্বে রাজ্যের কোন পুরুষের চেয়ে কম ছিলেন না। কাজেই যাহারা বাহাদুরকে রাজা করিতে গররাজী, তাহারা বড় ফাঁপরে পড়িয়া গেল।—রাণীর সঙ্গে যে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিবার জো নাই! ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাহারা শেষে এক ফন্দী বাহির করিল; মোগল যে নিজামশাহী-রাজ্যের দুশমন্, তা তাহারা জানিত, তাহাদেরই ডাকিয়া আনিল চাঁদবিবির দলকে জব্দ কবিবার জন্য।

মোগল-বাদশা আক্‌বরও তো ইহাই চান। ভারতের উত্তর ভাগের রাজ্যগুলি একে একে সবই তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়াছে; দক্ষিণ ভাগের রাজ্যগুলি ঐরূপে পদানত হইলেই বাদ্‌শার মনের সাধ পূর্ণ হয়; হিমালয়-পর্ব্বত হইতে সুরু করিয়া সাগরতট—কুমারিকা পর্য্যন্ত গোটা ভারতবর্ষেই তাঁহার নামের জয়ডঙ্কা বাজে। কিন্তু মস্ত বাধা এই নিজামশাহী-রাজ্য আর তার আশপাশের রাজ্যগুলা। এখানকার রাজারা যেমন দুর্দ্দান্ত, তেম্‌নি যুদ্ধে ওস্তাদ। কোনরকমে একবার ইহাদের একটাকে ঘায়েল করিতে পারিলে

বাকিগুলোকে বাগে আনিতে বড় বেশী বেগ পাইতে হইবে না। এগুলা হাতে আসিলে দক্ষিণদেশের রাজ্যগুলার জন্য কোনই ভাবনা থাকিবে না—হাত বাড়াইলেই পাওয়া যাইবে। রাণীর শত্রুদের নিমন্ত্রণে ফলারে পেটুক বামুনের মত বাদ্‌শা মহা খুশী হইলেন, আর তখনই ছেলে মুরাদকে আমেদনগর দখল করিতে হুকুম দিলেন। 'আল্লা হো আকবর' রবে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া মোগলের ফৌজ পঙ্গপালের মত আমেদনগরের দিকে ছুটিল।

মোগলেরা নগর দখল করিতে আসিতেছে শুনিয়া চাঁদবিবি হুকুম দিলেন—'বন্ধ করো কেল্লার দরজা। দেখি একবার বাদ্‌শা কেমন ক'রে কেল্লা দখল করে!' ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে সদরের মস্ত বড় লোহার দরজা তখনই বন্ধ হইয়া গেল। রাণী ভাবিয়া দেখিলেন, কেল্লা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া অগুনতি মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করা সুবিবেচনার কাজ নয়। তার পর ঘরেও শত্রু। নিজের পক্ষে সৈন্য বড় বেশী নাই; ইহাদের লইয়া লড়াই করিতে বাহির হইলে মোগল-সেনারা পিষিয়া মারিবে। দলবল বাড়ানো দরকার। কাছেই ছিল বিজাপুর-রাজ্য; তাহার সেনাবল অল্প নয়। এ-সময় বিজাপুরের সাহায্য পাইলে বড় উপকার হয়। কিন্তু বিজাপুরের সঙ্গে নিজামশাহী-রাজ্যের মারামারি কাটাকাটি লাগিয়াই আছে। তবে কথা এই যে, বিজাপুরের রাজা তাঁহার পর নয়,—নিতান্তই আপনার জন। বিজাপুরের রাজবংশেই তাঁহার

বিবাহ হইয়াছিল,—তিনি তাহাদেরই কুলের বউ। তা ছাড়া মোগলেরা যেমন নিজামশাহীর দুশমন্, তেম্‌নি বিজাপুরীদেরও দুশমন্। রাণী বিজাপুরের রাজাকে লিখিয়া পাঠাইলেন,— ‘হাজার হইলেও বিজাপুর নিজামশাহীর পর নয়। এই দুই রাজ্যের যে বিবাদ, সে তো ঘরোয়া বিবাদ; আজ আছে, কাল নাই। কিন্তু বাহিরের শত্রু আসিয়া এক রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিবে, আর-এক রাজ্যের রাজা দূরে দাঁড়াইয়া তামাশা দেখিবেন, এটা কি উচিত? আজ নিজামশাহী-রাজ্যের ইজ্জৎ গেলে, স্বাধীনতা গেলে, শত্রু সাহস পাইয়া কালই হয়তো তোমাদেরও গলা টিপিয়া ধরিবে। তাই বলি, এস, আমরা এ-সময়ে ঘরোয়া বিবাদ ভুলিয়া একযোগে মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়াই। যুদ্ধস্থলে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া দেখা যাক—মোগলই বড়, না, আমরাই বড়; মোগলের দেহেই বা কত বল, আর আমাদের বাহুতেই বা কত শক্তি!’

চাঁদবিবির কথা বিজাপুরেব রাজা ঠেলিয়া ফেলিতে পারিলেন না। তিনি শত্রুতা ভুলিয়া নিজামশাহী-রাজ্যের এই দুঃসময়ে সাহায্য করিতে রাজী হইলেন। কিন্তু রাজী হইলেই তো কাজ হইল না,—তোড়জোড় যোগাড়যন্ত্র করিতে হইবে, তবে তো। দেরি হইতে লাগিল।

এদিকে মুরাদের সৈন্যদল মহা হল্লা করিয়া কেল্লার চারি ধার ঘিরিয়া ফেলিয়াছে—কেল্লা ভাঙিয়া চূরমার করিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছে। বন্দুক আর কামানের দুড়ম দুড়ুম

গুড়ুম গুড়ুম শব্দে কানে তালা ধরাইয়া দিয়াছে। রাণীর সৈন্যেরা কাপুরুষ নয়, তাহারাও কেল্লা দখলে রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। চাঁদবিবি নিজেই তাহাদের উৎসাহে মাতাইতেছেন, তাহাদিগকে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়া শত্রুদের হঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহারা সংখ্যায় অল্প: আক্রমণের উপর আক্রমণে কেমন করিয়া স্থির থাকিবে? মাঝে মাঝে মুসড়াইয়া পড়ে, অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিতে চায় না; কিন্তু যেই আবাব রাণী যুদ্ধের বেশে কাছে আসিয়া দাঁড়ান, 'মার্, মার্—দেশের শত্রু মার্' বলিয়া হাঁক দেন, সকলে যেন নূতন বল ফিরিয়া পায়, যে মরিতে বসিয়াছে সেও একবার তলোয়ারের বাঁটটা মুঠা করিয়া ধরিবার চেষ্টা করে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, এম্‌নি করিয়া সবলে দুর্ব্বলে যুদ্ধ চলিল; কিন্তু কেহ কাহাকেও হারাইতে পারিল না।

মুরাদ শীঘ্রই বুঝিলেন, 'এ বড় কঠিন ঠাঁই'; কাজটা যত সহজ ভাবিয়াছিলেন, তত সহজ নয়। এমন সময় খবর আসিল, চাঁদবিবিকে সাহায্য করিবার জন্য বিজাপুর হইতে অনেক ফৌজ আসিতেছে। 'একা রামে রক্ষা নাই—সুগ্রীব দোসর!' এক চাঁদবিবির দাপটেই অস্থির, তার উপব আবার বিজাপুরী-ফৌজ! দুই দল এক হইলে কি আর রক্ষা আছে! মুরাদ ঠিক করিলেন, বিজাপুবী-ফৌজ পৌঁছিবাব পূর্ব্বেই কেল্লা ফতে করিতে হইবে—তা সে যেমন করিয়াই

হোক। যত সৈন্য, যত তোড়জোড় সব এক করিয়া মুরাদ কেল্লার উপর পড়িলেন। নিমেষে নিমেষে বাজ পড়িতে থাকিলে যেমন আওয়াজ হয়, তেম্‌নি করিয়া তাহাদের কামান ডাকিতে লাগিল; তা ছাড়া তীর-ধনুক আর বন্দুক লইয়া কত বীর যে যুদ্ধে নামিয়াছে, তার তো লেখাজোখাই নাই।

কিন্তু চাঁদবিবির মনে এতটুকু ভয়-ভাবনা নাই। তাঁহার যুদ্ধের বেশ—গাঁয়ে লোহার বর্ম্ম, পিঠে ঢাল, হাতে তলোয়ার! ঘোড়সওয়ার হইয়া রুপার ঝালর-দেওয়া 'বোরকা'য় মুখ ঢাকিয়া তিনি ছুটাছুটি করিতেছেন, আর সৈন্যদের উৎসাহ দিতেছেন—'যুদ্ধ করো, দেশের কাছে, স্বাধীনতার কাছে প্রাণ অতি তুচ্ছ জিনিস। দেশ গেলে, স্বাধীনতা গেলে, নিজাম-শাহী-রাজ্যের মান গেলে, বাঁচিয়া কি ফল?'

সৈন্যেরা রাণীর উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়া অস্ত্রের খেলায় মোগল-সৈন্যদের তাক লাগাইয়া দিতেছে। একে কেল্লার আশ্রয়, তাহার উপর তাহারা রাণী চাঁদবিবির চালে চলিতেছে। মুরাদ কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শেষে মোগলরা চুপিচুপি এক কাণ্ড করিল; তাহারা কেল্লার দেওয়ালের নীচে সুড়ঙ্গ করিয়া, তাহাতে বারুদ ভরিয়া, আগুন ধরাইয়া দিল। দেওয়ালের অনেকটা উড়িয়া গেল, আর সেই ভাঙা জায়গা দিয়া কেল্লার ভিতর ঢুকিয়া পড়িবার জন্য মোগল-সৈন্যদের মধ্যে হুড়াহুড়ি আরম্ভ হইল। পিঁপড়ের সারির মত মাথায় মাথায়, গায় গায় ঘেঁষাঘেঁষি

সৈন্য, দলের পর দল, তার পর দল। কাহাঁরো হাতে বন্দুক, কাহারো হাতে তলোয়ার, কাহারো হাতে বল্লম। এই অগুনতি সেনার বেগ সহ্য করে কাহার সাধ্য? তাহারা জোয়ারের জলের মত সোঁ সোঁ করিয়া কেল্লার ভিতব ঢুকিয়া পড়িবে, আর নিজামশাহী সেনাদলকে কুটার মত ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। রাণীর সেনারা অনেকেই ভয় পাইয়া পলাইতে লাগিল। চারি দিকে 'গেল গেল' রব—সর্ব্বনাশ হইতে আর যেন এক লহমা বাকি।

এমন সময় সকলে আশ্চর্য্য হইয়া অবাক্ হইয়া দেখিল—ঘোড়ার পিঠে এক দেবীমূর্ত্তি মোগলের পথ আগুলিয়া রণরঙ্গে নাচিতেছেন! হাতের তলোয়ারে আগুন জ্বলিতেছে—চোখে-মুখেও তাঁহার আগুনের তেজ! মুখের ঘোমটা খুলিয়া পড়িয়াছে—হুঁশ নাই। মাথার চুলও খুলিয়া গিয়া হাওয়ায় উড়িতেছে। বন্-বন্ শব্দে তাঁহার কানের পাশ দিয়া, মাথার উপর দিয়া, মোগলের তীর-গুলি ছুটিতেছে,—ভ্রূক্ষেপ নাই। এই দেবী যে আকাশের দেবী নন, পৃথিবীর দেবী—চাঁদবিবি, তাহা তোমরা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছ। তাঁহার তেজ আর সাহস দেখিয়া নিজামশাহী সেনাদের দেহে যেন অসুরের বল আসিল, সকলে জয়ধ্বনি করিয়া মোগলের সামনে দাঁড়াইল, আর এমনভাবে লড়াই করিতে লাগিল যে সামনে এগোনো তো দূরের কথা, মোগলরা পিছু হঠিবারও পথ পাইল না।

পরের দিন সকাল বেলা তাহারা অবাক্ হইয়া দেখিল, দেওয়ালের যেখানটা তাহারা অতি কষ্টে উড়াইয়া দিয়াছিল, তাহা আবার বেমালুম গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। ঠিক যেন আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের কাণ্ড আর কি! কিন্তু আসলে ইহা আশ্চর্য্য প্রদীপের আশ্চর্য্য কাণ্ড নয়, মানুষেরই হাতের কাজ। রাণীর হুকুমে কেল্লার লোকেরা সারা রাত জাগিয়া সাবধানে চুপি চুপি দেওয়ালের ভাঙা জায়গাটা গাঁথিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু লড়াই তখনও শেষ হয় নাই। মুরাদের সেনারা কেল্লা দখল করিবার জন্য সমানভাবেই লড়াই চালাইতেছে। কেনই বা চালাইবে না? তাহাদেব এক দল হয়বান হইলে, কি হঠিয়া গেলে, আর এক দল সাম্‌নে আসিয়া খাড়া হয়; গোলাগুলি ফুরাইলে আবার গাড়ী-গাড়ী গোলাগুলি যেন মন্ত্রবলে আসিয়া পড়ে। কিন্তু রাণীর সেনারা কেল্লার মধ্যে আটক; যাহারা মরিতেছে, তাহাদের বদলে আর কেহ দাঁড়াইবার নাই। গুলিগোলা শুধু জলের মতই খরচ হইতেছে, বাহির হইতে আসিবার কোন উপায় নাই। হঠাৎ রাণীর কাছে লোক আসিয়া খবর দিল—'আর রক্ষা নাই! গুলি-গোলা প্রায় সাবাড়! শত্রুরা রুখিয়া আসিলেই অনায়াসে কেল্লা ফতে করিবে।'

কথা শুনিয়া চাঁদবিবি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর হঠাৎ উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, "ভয় নেই—কোন

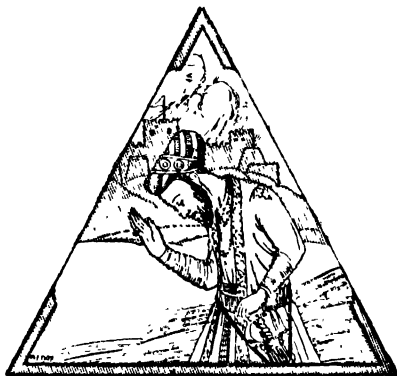
ভয় নেই। গুলিগোলার কিছুমাত্র অভাব হবে না। সৈন্যদের বুক্ ঠুকে লড়াই করতে বলো।”

রাণী তার পর যাহা করিলেন, সে-কথা শুনিলে তোমরা নিশ্চয় অবাক্ হইয়া যাইবে। ঘরে যত মণিমাণিক্য, টাকা-মোহর, সিকি-আধুলি ছিল, নিজের যে-সব সোনার দামী দামী গয়নাগাটি ছিল, সব তিনি বাহির করিয়া দিলেন—গোলাগুলির অভাব পূরণ করিবার জন্য। আর কেহ হইলে নিশ্চয় এ-সব গোপনে সরাইয়া নিজেও পলাইয়া বাঁচিবার পথ দেখিতেন; কিন্তু তিনি নিজামশাহীর স্বাধীনতার ও মানের তুলনায় মণি-মাণিক্য হীরা-জহরৎ, এমন কি নিজের প্রাণটাকেও অতি তুচ্ছ মনে করিতেন। যাই হোক, চাঁদবিবির সৈন্যদের তখন কি ফুর্ত্তি! টাকা-মোহর সিকি-আধুলি গয়না, এই সব তাহাদের গোলাগুলি! তাহারা খুব মজা করিয়া সেগুলি তোপের মধ্যে ঠাসিতে লাগিল, আর সেই সব টাকা-মোহর শিলাবৃষ্টির মত মোগল-সৈন্যের মধ্যে ছিটকাইয়া পড়িয়া তাহাদের খুনজখম করিতে লাগিল।

এমন যুদ্ধ আর এমন সোনা-রুপার গোলাগুলি কে কবে দেখিয়াছে? মোগল-সেনাপতিরা কিছুক্ষণের জন্য শত্রুতার কথা না ভুলিয়া থাকিতে পারিল না। সাবাস্ আমেদনগরের রাণী! স্বাধীনতা যে কি সামগ্রী, দেশের মান যে কি বস্তু, তা তুমিই ঠিক ঠিক বুঝিয়াছ। কে বলে তুমি বিবি!—তুমি রাণী—রাণীর রাণী মহারাণী স্লুলতানা। এই বলিয়া মোগল-

সেনাপতিরা মাথা নোয়াইয়া চাঁদ সুলতানার উদ্দেশে বার-বার সেলাম জানাইতে লাগিল। এত দিন সবাই আমেদনগরের এই রাণীকে চাঁদবিবি বলিত, এই যুদ্ধের পর তাঁহার নাম হইল—চাঁদ সুলতানা।

মুরাদ দেখিলেন, যুদ্ধের গতিক বড় ভাল নয়, তার পর বিজাপুরের সৈন্যও কখন হুড়মুড় করিয়া ঘাড়ে পড়ে ঠিক নাই, তাই আর গোলমাল না করিয়া চাঁদ সুলতানার সঙ্গে তিনি আপোস করিয়া ফেলিলেন। ঠিক হইল, বাহাদুরই নিজামশাহী-রাজ্যের রাজা থাকিবে, আর তাহাকেই সকলে রাজা বলিয়া মানিবে।



গরীবের মা-বাপ

ইংরেজের আগে ভারতের মালিক ছিলেন মোগল-বাদশারা। মোগল-বাদশারা এক-আধ বছর নয়, আড়াই-শো তিন-শো বছর এ দেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

এই মোগল-বাদশাদের মধ্যে শাজাহান ছিলেন ভারি অমায়িক লোক। ফুলের সুবাস যেমন চারি দিক আমোদিত করে, তাঁহার নামযশও তেমনি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যাহাদের লইয়া রাজার রাজ্য, সেই প্রজাদের তিনি ছিলেন একেবারে মা-বাপ। রাজা-বাদশার কাছে গরীব প্রজার নালিশ করিবার কিছু থাকিলে, আগে সরকারী লোকজন চাকর-বাকরদের ঘুষঘাষ বা ভেট দিয়া খুশী করিতে হইত। না করিলে অনেক সময় প্রজার আরজি রাজার কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছিত না। কিন্তু বাদশা শাজাহানের আমলে প্রজাদের তেমন কোন অসুবিধা ছিল না।

বাদশা থাকিতেন আগ্রার প্রকাণ্ড কেল্লার মধ্যে। কেল্লার পূব দিকে যমুনা নদীর তীর। ঐ দিকের দেওয়ালে ছিল একটা ঝরোকা। বাদশা রোজ সকাল বেলা সেই ঝরোকায় গিয়া হাজির হইতেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য, আর তাঁহার

কাছে নালিশ করিবার জন্য সেই সময় যমুনার তীরে অনেক প্রজা জমায়েৎ হইত। বাদশার ঝরোকা হইতে তখন প্রজাদের কাছে একটা লম্বা সুতা ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। প্রজাদের মধ্যে যাহাদের নালিশ করিবার থাকিত, তাহারা নিজের আরজি সেই সুতায় লটকাইয়া দিত, আরজি একেবারে ঝরোকায় খোদ বাদশার হাতে গিয়া পড়িত। এই রকম ব্যবস্থায় গরীব প্রজাদের ভারি সুবিধা হইত। তাহারা মামলা-মোকদ্দমার খরচ-খরচা হইতে রেহাই পাইত। বাদশা নিজেই তাহাদের নালিশের সুবিচার করিয়া দিতেন।

শাজাহান বাদশার প্রাণটি ছিল ভারি নরম—সে প্রাণ প্রজার দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিলে গলিয়া যাইত। তিনি গরীব-দুঃখী, পুত্রহীনা বিধবা বা বিদ্বান্ পণ্ডিতদের ভরণপোষণের সুবিধার জন্য লাখেরাজ জমি দান করিতেন। লাখেরাজ জমির একটা মস্ত সুবিধা এই, সে জমিতে বাস করিলে রাজাকে একটি পয়সাও খাজনা দিতে হয় না। প্রজার উপর শাজাহান বাদশার দরদ ছিল কতটা, তার একটা গল্প বলি শোন।

একদিন রাত্রি অনেক হইয়াছে, তবুও বাদশা রাত জাগিয়া রাজ্যের খাজনাপত্রের হিসাব দেখিতেছেন। হিসাবপত্র উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ একখানা কাগজে তাঁহার নজর পড়িল; দেখিলেন, একটা মহালের খাজনা আগের বছর অপেক্ষা হাজার-কয়েক টাকা বাড়িয়াছে। হঠাৎ এই আয় বাড়িল কেমন করিয়া, বাদশা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন

না। মনের ধোঁকা মিটাইবার জন্য তখনই দেওয়ান সাদুল্লা খাঁকে তলব করিলেন।

দেওয়ান-সাহেব তখন তোষাখানার মধ্যে ;—হাতে কাগজপত্র। রাত জাগিয়া হিসাবপত্র ঠিক করিতে হওয়ায় ঘুমে তাঁহার চোখ দুটি জড়াইয়া আসিতেছিল। এমন সময় দূত আসিয়া বাদশার হুকুম জানাইল।

বাদশার তলব, তার পর এত রাত্রে, নিশ্চয়ই কোন জরুরি কাজ আছে। দেওয়ান তো তখনই শশব্যস্তে ছুটিলেন দেখা করিতে। কিন্তু তাঁহার পৌঁছিবার আগেই দূত ফিরিয়া গিয়া বাদশাহকে জানাইয়া দিল যে, দেওয়ান-সাহেব কাগজপত্র হাতে লইয়া ঢুলিতেছিলেন।

এদিকে দেওয়ানও আসিয়া হাজির। বাদশা তাঁহাকে দেখিয়া, একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "মন্ত্রী, আমার জানা ছিল, তুমি সজাগ হয়ে রাজ্যের শাসন চালাচ্ছ,—সব কাজই নিজে দেখছ শুনছ। আর সেই বিশ্বাসেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে একটু বিশ্রাম করছিলুম। কিন্তু এখন দেখছি, আমার সেই বিশ্রামটুকু তুমিই ভোগ করতে সুরু করেছ। কাজেই এর পর থেকে আমাকেই রাত জেগে তোমার কাজ করতে হবে।"

বাদশার কথা শুনিয়া দেওয়ানের তো মাথা হেঁট। তিনি নিজের দোষের জন্য মাপ চাহিলেন।

বাদশা তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাগজপত্রে দেখছি একটা মহালের খাজনা এ বছর অনেক বেশী ধরা হয়েছে,

এর কারণ আমি জানতে চাই। আমার আমলে চাষবাস করবার মত এমন কোন জমি তো প'ড়ে ছিল না, যা চাষ করিয়ে খাজনা বাড়ানো যেতে পারে? ঐ মহালের সরকারী কর্ম্মচারীকে লিখে এখনি ব্যাপারটার তদন্ত কর।"

খোঁজখবর লইয়া দু-চার দিন পরে দেওয়ান-সাহেব বাদশাকে জানাইলেন, "হুজুর, এ বছর নদী স'রে যাওয়াতে খানিকটা জমি দেখা দিয়েছে, আর সেই নূতন জমিটার জন্যেই এ বছর মহালটার মোট খাজনা কিছু বেশী ধরা হয়েছে।"

শুনিয়া বাদশা বলিলেন, "বেশ, কিন্তু সন্ধান ক'রে দেখেছ কি, জমিটা বাস্তবিকই রাজার জমি—খাসমহাল—না, কাউকে দান-করা কোন জমির এলাকাভুক্ত?"

মন্ত্রী আবার তদন্ত করিয়া, এক দিন বাদশাকে জানাইলেন, "জমিটায় রাজার দখল নেই, এটা বিধবাদের দান-করা লাখেরাজ জমিরই এলাকায়। এত দিন নদীর ভেতরে সেটা ছিল, এখন নদী শুকিয়ে যাওয়ায় ফের দেখা দিয়েছে।"

বাদশা বলিয়া উঠিলেন, "বুঝেছি, বুঝেছি, কেন নদী শুকিয়ে গেছে! সংসারে আপনার বলতে যাদের কেউ নেই, লাখেরাজভোগী সেই সব পতি-পুত্রহীনা মেয়েছেলের চোখের জলে নদী শুকিয়ে গেছে। এ জমিতে আমার স্বত্ব নেই—এ জমি তাদের। তাদের জমি কেড়ে নেওয়া মানে, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া—ঐ অসহায় বিধবাদের সর্ব্বনাশ করা।"—এই বলিয়া বাদশা একটু থামিলেন, তার পর একটু

উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "যে মহালের জমি নিয়ে এই গোল, সেই মহালের সরকারী কর্ম্মচারীটাই যত নষ্টের মূল, সে একটি আস্ত শয়তান; তাকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে পিষে মারলেই ঠিক হ'ত, কিন্তু তাকে প্রাণে মারতে চাই নে। এখনি তাকে আমার চাকরি থেকে বরখাস্ত কর। রাজ্যে এ রকম কর্ম্মচারী থাকলে রাজারই বদনাম হবে। শয়তানের সাজার বহর দেখে কেউ কখনও আর কারও ন্যায্য স্বত্বের ওপর হাত দিতে ভরসা করবে না। আর শোন, ঐ জমিটার দরুন এ যাবৎ যত টাকা খাজনা উশুল হয়েছে, এখনি সরকারী তবিল থেকে কড়ায় গণ্ডায় সেই টাকা মিটিয়ে দাও—জমির মালিক সেই বিধবাদের। আর তাদের ব'লে দাও, এ জমির মালিক বাদশা শাজাহান নয়, মালিক তারাই।"

—গল্পটা শুনিয়া এখন বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিলে, প্রজার উপর বাদশা শাজাহানের দরদ ছিল কতটা। প্রজারা তাঁহার আমলে যে কি সুখেই ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। লোকে তাই তাহাদের গুণের বাদশার নামে ফার্সীতে একটা ছড়া রচনা করিয়াছিল। ছড়াটার মানে এই:

'বাদশা—মোদের গুণের বাদশা! তুমি তোমার প্রজাদের সমস্ত বোঝা নিজের ঘাড়ে তুলিয়া লইয়া তাহাদের ভার লঘু করিয়া দিয়াছ। তোমার আমলে অবিচার অত্যাচার বলিয়া কোন কিছু নাই, কারণ তুমি যে তোমার চোখ হইতে আরামের ঘুমটুকুও দূর করিয়া দিয়াছ।'



ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগে গোলকুণ্ডা বলিয়া একটা রাজ্য আছে। আব্দুল্লা কুতব-শা ছিলেন এক সময়ে এই রাজ্যের রাজা। তিনি মারা গেলে কে সিংহাসনে বসিবে, এই লইয়া মহাগোল বাধিল। শেষে রাজ্যের সব হোমরা-চোমরা আমীর-ওমরারা মিলিয়া রাজার ছোট জামাই আবুল-হাসানকেই সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন।

আবুল-হাসান ভাল ঘরেরই ছেলে, কিন্তু আগে ঘর-গৃহস্থালীতে তাঁর মন ছিল না, ফকির-সন্ন্যাসীর বেশে খোশখেয়ালে যেখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; তার পর তাঁহার আত্মীয়-স্বজনরা তাঁহাকে পাকড়াও করিয়া আনিয়া বিবাহ দিয়া সংসারী করেন। এইবার তিনি একেবারে রাজা হইয়া সিংহাসনে বসিলেন। ফকির হইতে রাজার জামাই, রাজার জামাই হইতে একদম রাজা!—গোলকুণ্ডার মত ধনধান্যে-ভরা রাজ্যের রাজা! কেয়া ফুর্তি! আবুল-হাসান নাচগান, হাসিঠাট্টা, আমোদ-আহ্লাদ লইয়া মাতিয়া উঠিলেন।

রাজার কাজে—দেশশাসন আর প্রজাপালনের দিকে—তাঁহার আর মন রহিল না। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া কর্ম্মচারীরা যাহার যাহা খুশী, তাহাই করিতে লাগিল।

তখন মোগল-বাদশা আওরংজীবের আমল। তাঁর দাপটে সকলে থর্‌-থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে। একটা খাপের ভিতর যেমন একখানা-বই দুখানা তলোয়ার থাকিতে পারে না, তেম্‌নি বাদশা আওরংজীবেরও ধারণা—গোটা ভারতের মধ্যে একা তিনিই রাজত্ব করিবেন, অন্যের সেখানে রাজত্বের অধিকার নাই। যেখানে যত স্বাধীন রাজ্য ছিল, প্রায় সমস্তই তাঁহার দখলে আসিয়াছে। বাকিগুলিও যত শীঘ্র পারেন দখলে আনিবেন, ইহাই তাঁহার মতলব। বাদশার নজর পড়িল গোলকুণ্ডার উপর।

কিছু দিন আগে আওরংজীব যখন বিজাপুর-রাজ্য দখল করিতে যান, তখন এই গোলকুণ্ডার রাজা নিজের সৈন্য-সামন্ত দিয়া বিজাপুরের রাজাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা—দুইটি রাজ্যই গায়ে গায়ে লাগাও। এই দুই রাজবংশের মধ্যে খুব আত্মীয়তা। দুই রাজবংশই 'শিয়া' মুসলমান, আর বাদশা আওরংজীব ছিলেন ঠিক তার উল্‌টো—সুন্নী। শিয়া ও সুন্নীতে কোনদিনই বনিবনা হইত না। গোলকুণ্ডার রাজা একে ভিন্ন মতের মুসলমান, তার উপর আবার শত্রু বিজাপুর-রাজ্যের বন্ধু; কাজেই তাঁকে জব্দ করিতে পারিলে বাদশার মনের ঝাল মেটে। শুধু তাই

নয়, গোলকুণ্ডা সত্যিসত্যিই সোনার রাজ্য। এই রাজ্যের খনিতে সোনা আছে, হীরামণি আছে, লোহা আছে, দামী দামী আরও কত কি আছে! জমিতেও সোনা ফলে—কত রকমের শস্যে যে ক্ষেতের শোভা হয় বলিয়া শেষ করা যায় না। এমন দেশ জয় করিতে না পারিলে আর মজা কি! বাদশা বিজাপুর-রাজ্য জয় করিয়াই গোলকুণ্ডার উপর রুখিয়া দাঁড়াইলেন।

কি! জলে বাস করিয়া কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া! আমি হইলাম ভারতের শাহান্-শা বাদশা, দাপটে যাঁর বড় বড় রাজ্যের রাজা কেঁচো হইয়া ঘরের কোণে মুখ লুকায়, তাঁর সঙ্গে ঝগড়া! সৈন্য দিয়া তাঁর শত্রুর বল বাড়াইবার চেষ্টা! এইবার দেখাইব তার মজা; বার করিব যত-সব সোনার খনি, আর হীরার খনির তাঁবেদারি! বাদশা অগনতি সেনা-সামন্ত লইয়া ঘটা করিয়া গোলকুণ্ডা ঘেরাও করিলেন।

রাজা আবুল-হাসানের যে রাজ্যের উপর নজর নাই, তিনি যে আমোদ-আহ্লাদ লইয়াই মত্ত, সে খবর বাদশা আগেই পাইয়াছিলেন। ভাবিলেন, কেল্লা দখল করিতে আর কতক্ষণ? কিন্তু কেল্লায় ঘা মারিয়া দেখেন, ঠিক যেন কেউটে সাপের বাসা! সেনাপতি আব্দুর রজ্জাক্ লারী যেন সেখানে ভিড় পাকাইয়া ফণা ধরিয়া বসিয়া আছে, কেল্লার গায়ে টোকা মারিলেই ফোঁস করিয়া ছোবল মারিতে আসে। তাহার তেজের কাছে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য! এক দিন নয়, দু-দিন

নয়, ক্রমাগত আট মাস কাল চেষ্টার পর চেষ্টা করিয়া বাদশা কেল্লার কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

তাঁর তাক লাগিয়া গেল,—হাঁ, লড়াইওয়ালা বটে সেনাপতি আব্‌দুর রজ্জাক্ লারী! যুদ্ধ করিতে নামিলে মনে হয় যেন একাই এক হাজার! মুখোমুখি হইয়া যুদ্ধ চালাইতে পারে, এত বড় বুকের পাটা আর কারও আছে বলিয়া মনে হয় না। আবুল-হাসানের জোর বরাত যে এমন একটা লোককে দলে পাইয়াছে। নইলে এত দিন কবে যে তাঁহার ফুর্ত্তির ঘোর ছুটিয়া যাইত, তাহার ঠিক নাই।

কিন্তু বাদশা আওরংজীব দমিবার পাত্র নন; তিনি যখন দেখিলেন যে, বলে সুবিধা হইতেছে না, তখন কৌশল ধরিলেন। লারীকে লোভ দেখাইয়া রাজার নিকট হইতে ভাঙাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন, টাকা আর পদ-মানের লোভে মানুষ না-করিতে পারে, এমন কাজ দুনিয়ায় নাই। বাদশা গোপনে বলিয়া পাঠাইলেন—'টাকা দিব—যত চাই, তা ছাড়া ছ-হাজার সেনার মন্‌সবদার, কি-না সেনাপতি করিয়া দিব। রাজার কাজ ছাড়িয়া দাও।' রজ্জাক্ গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "হারাম, হারাম! দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকিতেও মনিবের যে দুশমন, তার দেওয়া টাকা আর পদ-মানকে আমি শয়তানের খয়রাৎ ছাড়া আর কিছুই মনে করি না।"

যে-লোক বাদশার তরফ হইতে তাহাকে ভাঙাইয়া আনিতে গিয়াছিল, সে জানিত, রজ্জাকের মত প্রভুভক্ত বীর রাজা আবুল-হাসানের আর নাই। তাঁহার দলের অনেকেই তলে তলে বাদশার সঙ্গে যোগ দিয়াছে, অনেকে যোগ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। তাই ভরসা করিয়া বলিল, "বাদশার বিপক্ষে তুমি কয় জনকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ করিবে শুনি?"

রজ্জাক্ বুক ঠুকিয়া কহিলেন, "কারবালার যুদ্ধে ইমাম হোসেনের সঙ্গে কয় জন ধর্ম্মের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছিল?—মোটে বাহাত্তর জন। আর বিপক্ষে যুদ্ধ করেছিল—বাইশ হাজার লোক। বিপক্ষের দল ভারী দেখে তো বাহাত্তর জন ভয় পায় নি, তারা বীরের মত লড়াই ক'রে প্রাণ দিয়েছিল। মরি তো সেই কারবালার বীরদের মতই গৌরবের সঙ্গে মরবো। আব্দুর রজ্জাক্ প্রাণের ভয় করে না।"

মুখের কথায় আর কিছুই হইতেছে না দেখিয়া লোকটা বাদশা আওরংজীবের নাম-সহি-করা একখানা চিঠি রজ্জাকের হাতে দিল। তাহাতে রজ্জাক্‌কে সত্যসত্যই মনসবদারি দিবার কথা ছিল। অন্য কোন লোক হইলে যে বাদশার এই চিঠি মাথায় ধরিয়া ধন্য হইত, তাহার সন্দেহ নাই। রজ্জাক্ উহা লইয়া কি করিলেন, জান? নিজের দলের সৈন্যদের সব ডাকিয়া চীৎকার করিয়া চিঠিখানা পড়িলেন, তার পর তাদের সাম্‌নেই চিঠিখানা টুকরো-টুকরো করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেখাইলেন যে, শত্রু যত বড়ই হোক না কেন,

তার দেওয়া মানকে তিনি তৃণের চেয়েও তুচ্ছ মনে করেন। এত বড় তেজী, মানী বাদশার চিঠির এই দুর্দ্দশা দেখিয়া শক্রপক্ষ যে চটিয়া আগুন হইল, তাহা তোমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছ। তাহারা সুদে আসলে ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। টাকার লোভে রাজা আবুল-হাসানের অনেক বড় বড় কর্ম্মচারী তলে তলে বাদশাব পক্ষে যোগ দিয়াছিল ; তাদেরই এক জন এক দিন শেষরাত্রে—খুব অন্ধকার থাকিতে থাকিতে, কেল্লার খিড়কী-দুয়ার খুলিয়া শত্রুদের ভিতরে ঢুকিবার পথ করিয়া দিল। খোলা দরজা দিয়া বাদশার পক্ষের সেনা-সামন্তরা পিঁপড়ার সারির মত কেল্লার মধ্যে ঢুকিতে লাগিল।

শত্রুর জয়ধ্বনি আর অস্ত্রেব ঝন্‌ঝনায় রজ্জাকের ব্যাপাব বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি পাগলের মত হইয়া উঠিলেন ; কেল্লা-রক্ষার এত চেষ্টা বুঝি সব বিফল হইয়া যায়! যাই হোক 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।' রজ্জাক্ শত্রুর গতি রোধ করিবার জন্য খিড়কীর দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। কিন্তু তখন হাজার হাজার মোগল-সৈন্য কেল্লায় চড়াও হইয়া লোকজনের উপর অস্ত্র চালাইতেছে, আর সৈন্যের দল 'মার্ মার্' করিতে করিতে কেল্লায় ঢুকিতেছে। চারি দিকে চীৎকার—'জয় বাদশা আলমগীরের জয়!"

আওরংজীবকে সকলে আলমগীর, কি-না 'বিশ্ববিজয়ী' বাদশা বলিত। বাদশার লোকের সঙ্গে যুঝিয়া উঠা মানুষের অসাধ্য, কিন্তু মানুষে যাহা না-করিতে পারে, রজ্জাক্ তাহাই করিবার জন্য প্রস্তুত। তাঁহার তলোয়ারের মুখে আগুন জ্বলিতে লাগিল, আর যেখান দিয়া তিনি যাইতে লাগিলেন, মনে হইল যেন মস্ত বড় একটা ঘূর্ণি বায়ু সাম্‌নে যাহা পাইতেছে, সব ভাঙিয়া-চুরিয়া যাইতেছে। কিন্তু বিপক্ষের যত রাগ তাঁহার উপর, তাহারা চারি দিক হইতে বেড়িয়া ধরিয়া তাঁহাকে প্রাণপণে আক্রমণ করিল। আঘাতের পর আঘাতে তাঁহার সমস্ত দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল, সাজসজ্জা রক্তে লাল হইয়া উঠিল, তবুও ক্ষান্ত হইলেন না,—মরিয়া হইয়া অস্ত্র চালাইতে লাগিলেন।

রজ্জাক্ এত কাল যে মনিবের নিমক খাইয়াছেন, সে-কথা তো ভুলিতে পারেন নাই; তিনি বীর—মনিবের বিশ্বাসী সেনাপতি। কিন্তু একলা রজ্জাক্ যত বড় বীরই হোন না কেন, শত্রুপক্ষের শত শত সৈন্যের সঙ্গে যুঝিবেন কতক্ষণ? অস্ত্রের খোঁচায় একটা চোখ নষ্ট হইয়া গেল, কপালের মাংস ঝুলিয়া পড়িয়া আর একটা চোখও ঢাকিয়া গেল। রক্তক্ষয়ে দেহ অবশ হইয়া পড়িয়াছে। অবশ হাত হইতে কেমন করিয়া যে ঘোড়ার লাগাম্ খুলিয়া পড়িল, তাহা তিনি বুঝিতেও পারিলেন না। যুদ্ধে-জখম ঘোড়া তখন লাগাম্ আল্‌গা

হওয়ায় সওয়ার লইয়া উধাও হইয়া ছুটিল ;—'ধর্ ধর্' করিয়াও কেহ তাহাকে ধরিতে পারিল না।

সেনাপতি রজ্জাকের মনিব ফুর্ত্তিবাজ রাজা আবুল-হাসানের তখনও ফূর্ত্তির ঘোর কাটে নাই। মজলিসে নাচগান খানাপিনা পূরো দমে চলিতেছে। শত্রুর দল কেল্লায় ঢুকিয়াছে, তাহাদের হল্লায় আকাশ কাঁপিতেছে। দূতেরা দুঃসংবাদ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কোনদিকে তাঁহার খেয়াল নাই। বাইজীরা নাচের তাল ঠিক রাখিতে পারিতেছে না, ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া থামিয়া যাইতেছে। কিন্তু রাজা আবুল-হাসান তবুও বলিতেছেন, 'নাচো নাচো, আরও নাচো—যতক্ষণ পারি, ফুর্ত্তি আর ফুর্ত্তিতে কাটাই।'

ক্রমে কেল্লা ফতে করিয়া শত্রুর দল রাজবাড়ীতে ঢুকিল, তার পর তাহাদের সেনাপতি রুহুল্লা খাঁ রাজা আবুল-হাসানকে ধরিবার জন্য মজলিসে আসিয়া হাজির। আবুল-হাসান তাঁহাকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভয় পাইলেন না। রুহুল্লা খাঁ যেন তাঁর শত্রু নয়—মিত্র—অতিথি, এম্নি ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "আদাব! আদাব! আস্তে আজ্ঞা হয়, বস্তে আজ্ঞা হয়!"

সেনাপতি তো আবুল-হাসানের কথা শুনিয়া অবাক্; এ ঠাট্টা, না, সত্যিসত্যি আদর-যত্ন, তাহা তিনি প্রথমটা বুঝিতেই পারিলেন না। কিন্তু আসনে বসিতে-না-বসিতেই তৎক্ষণাৎ রাজা হুকুম করিলেন, "ওরে, লে আও খানাপিনা।"

খানা আসিলে রাজা রুহুল্লা খাঁকে খানা খাইবার অনুরোধ করিলেন, আর নিজেও খানা খাইতে খাইতে ফুর্তির সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। রুহুল্লা খাঁ ভাবিলেন, এ নিশ্চয় তাঁহার মন ভুলাইবার চেষ্টা ; কিন্তু তিনি যে কিছুতেই ভুলিবার লোক নন, তাহা বুঝাইবার জন্য খানা শেষ করিয়াই বলিলেন, "আপনাকে আলমগীর বাদশার কাছে যেতে হবে।"

রাজা কিছুমাত্র না দমিয়া কহিলেন, "চলুন।"

আবুল-হাসানকে লইয়া যাইতে যাইতে সেনাপতি দেখিলেন, আগেও যেমন, এখনও তেমনি—রাজার মনে এতটুকু ভয়-ভাবনা নাই, কথায় কথায় হাসি ঠাট্টা আমোদ!—এ পাগল, না, ক্ষ্যাপা, কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ?"

রাজা আবুল-হাসান বলিলেন, "কি কথা বলুন ?"

সেনাপতি বলিলেন, "দেখুন, আপনার রাজ্য গেছে, ঐশ্বর্য্য গেছে, আত্মীয়-স্বজন শত্রুর হাতে ধরা পড়েছে, নিজেও শত্রুর হাতে—আলমগীর বাদশার মত শত্রুর হাতে—ধরা দিতে চলেছেন, তবু আপনার মুখে হাসি! এ হাসির অর্থ তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

আবুল-হাসান হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কেন হাসব না সেনাপতি-সাহেব ? এ যে খোদার দোয়া। সুখও যে-খোদার দোয়া, দুঃখও তো সেই খোদারই খয়রাৎ।

তবে সুখ যেমন ফুর্ত্তি ক'রে নিয়েছি, দুঃখও তেমন ফুর্ত্তি ক'রে নোব না কেন ? দেখুন, আমি ছিলাম পথের ফকির—ভিক্ষে ক'রে খেতাম। খোদা কি ভেবে রাজা ক'রে সিংহাসনে বসালেন, আবার কি মনে ক'রে তাঁর সিংহাসন তিনিই কেড়ে নিচ্ছেন, সেই খোদাই জানেন। এতে আর আমার দুঃখ করবার কি আছে ? তার পর শেষকালটায় যে আল্লা আমাকে আর আমার ধনজনকে আর কারও হাতে না দিয়ে আলমগীর বাদশার মত লোকের হাতে সঁপে দিয়েছেন, সেও তো বড় কম ভাগ্যের কথা নয়। দুঃখ কেন করবো ?"

সেনাপতি এমন কথাও কখনও শোনেন নাই, এমন মানুষও কখনও চোখে দেখেন নাই, অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখেব দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তার পর আওরংজীব বাদশার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি রাগে গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কয়েদ করো,—কয়েদ, যত দিন বাঁচে দৌলতাবাদ-কেল্লার মধ্যে।"

রাজা আবুল-হাসান বাদশাকে সেলাম জানাইয়া কহিলেন, "বহুৎ আচ্ছা।"

* * *

বেলা হইলে দেখা গেল, একটা লোক গাছতলায় পড়িয়া আছে। গায়ে তাহার আঘাতের পর আঘাত, কম-পক্ষে বড় বড় সত্তরটা আঘাত বেশ গণা যায়, তার পর ছোট ছোট আঘাত যে আরও কত আছে, তার' ঠিক নাই। রক্তে মাটি

ভিজিয়া গিয়াছে। কিন্তু লোকটা তখনও মরে নাই—ধুক্ ধুক্ করিতেছে। জনকয়েক মোগল-সেনা তাহাকে ধরাধরি করিয়া সেনাপতি রুহুল্লা খাঁর তাঁবুতে লইয়া গেল। সাম্‌নে পড়িল গোলন্দাজ-সৈন্যের সেনাপতি সাফ্‌শিকান্ খাঁ; তিনি সেই আধমরা লোকটাকে দেখিয়াই চেঁচাইয়া উঠিলেন, "আরে, এ যে সেই শয়তান—আব্‌দুর রজ্জাক্! ওর হাতে আমাদের কত লোক খুন-জখম হয়েছে, ওর জন্যেই আমাদের কেল্লা দখল করতে এত বেগ পেতে হয়েছে। কাটো এখনি ওর মুণ্ডু, ঝুলিয়ে রাখো সেটা কেল্লার ফটকের ওপরে।"

সেনাপতি রুহুল্লা খাঁ সত্যসত্যই বীর পুরুষ, তিনি বীরের কদর বুঝিতেন; বলিলেন, "খাঁ-সাহেব, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া কি বীরের কাজ! বাদশাকে খবর দিন—তিনি যা হুকুম দেবেন, তাই হবে।"

রাজা আবুল-হাসানকে তো বাদশা আগেই আটক করিয়াছেন—জন্মের মত। এইবার বীর সেনাপতি রজ্জাকের পালা। তিনি বাদশার চিঠি ছিঁড়িয়া তাঁহার অপমান, আর সেনা-সামন্তকে খুন-জখম করিয়া তাঁহার রাগ বাড়াইয়াছেন। বাদশা তাঁহাকে হাতে পাইলে কুকুর দিয়াই খাওয়াইবেন, না, আর কি করিবেন, তাহা কেহই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না।

কিন্তু বাদশা আলম্‌গীর রজ্জাকের খবর পাইয়া যে হুকুম দিলেন, তাহাতে সকলেই অবাক্ হইয়া গেল। হুকুম দিলেন—

'রজ্জাক্‌কে যেমন ক'রেই হোক, বাঁচাতে হবে; তার সেবা-শুশ্রূষার যেন কোনও ত্রুটি না হয়।' তিনি আরও বলিলেন, 'রজ্জাকের মত বীর আর ক'জন আছে, জানি না। তার মত লোক আর একটাও থাকলে আবুল-হাসানকে বাগে পাওয়া দায় হ'ত; রজ্জাক্ ম'রে গেলে বড়ই আপসোসের কথা হবে।'

চিকিৎসা চলিতে লাগিল। ষোল দিন চিকিৎসার পর বাদশা শুনিলেন, রোগীর জ্ঞান হইয়াছে, সে কথা বলিতেছে। বাদশা তখন রজ্জাক্‌কে খবর পাঠাইলেন—'তোমার সব দোষ মাফ করা হইল। তুমি ভাল হইলে তোমার, আর তোমার ছেলেদের আমি রাজসরকারে ভাল চাকরি দিব।'

কথা শুনিয়া রজ্জাক্ বাদশাকে ধন্যবাদ দিলেন, কিন্তু বলিলেন—'আর যে আমি বেঁচে উঠবো সে আশা নাই; খোদার মর্জ্জিতে এ-যাত্রা বাঁচলেও আর কখনও যে চাকরি করতে পারবো, তা মনে হয় না; আর যদিই বা চাকরি করি,—যখন একবার আমি রাজা আবুল-হাসানের নুন খেয়েছি, আর তাঁর হাজার দান মাথা পেতে নিয়েছি, তখন আর যারই করি নে কেন, তাঁর যে দুশমন—তার নোকরি কখনও করব না।'

বুদ্ধির বহর

মোগলের বাদশা আওরংজীবের মত চালাক-চতুর লোক আর বীরপুরুষ খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যুদ্ধ বিদ্যাটাও যেমন ভাল জানিতেন, বুদ্ধির খেলাটাও তেমনি ভাল খেলিতে পারিতেন।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকে আফগানিস্থান বলিয়া যে একটা পাহাড়ে দেশ আছে, তাহার অনেকটা তখন তাঁহার দখলে ছিল। তাঁহার বুদ্ধি আর বিক্রম দেখিয়া নানান দেশের নানান লড়াইওয়ালা-জাতেব তাক লাগিলেও এই আফগানরা কিন্তু মোটেই ভয় খাইত না। গায়ে তাহাদের অসুরের মত জোর, ইয়া লম্বা-চওড়া চেহারা। সমস্ত ধরাটাকেই তাহারা সরার মত ছোট মনে করে, বাদশা আওরংজীবের আর তাহারা কি তোয়াক্কা রাখিবে বল? আফগানিস্থান বশে রাখিবার জন্য বাদশা যাহাদের সেখানে রাখিয়াছিলেন, এই আফগানরা একটু জুৎ পাইলেই তাহাদের নাকালের একশেষ করিয়া ছাড়িত।

দেশটা একটু হাতের কাছে থাকিলে বাদশা তাহাদের এই আস্পর্দ্ধার শাস্তিটা অবশ্য হাতে হাতেই চুকাইয়া দিতেন। কিন্তু দেশটা একটু দূরে, তাহার উপর আবার পাহাড়েও বটে ; তাই তিনি নিজে আর কষ্ট স্বীকার করিতে রাজী হইলেন না। ভাবিয়া-চিন্তিয়া আমীর খাঁকে আফগানিস্থানের সুবাদার, কি-না লাটসাহেব, করিয়া পাঠাইলেন। লোকটা কতকটা তাঁহারই ধাতের—যেমন লড়ায়ে পটু, তেমনি চালাকিতেও মজবুত। ইহার আগেও দুই-তিনবার তিনি পাহাড়-পর্ব্বতে আফগানদের সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহাদের একহাত দেখাইয়া দিয়া আসিয়াছেন, কোনবারই তাঁহার হার হয় নাই। বাদশা তাঁহাকে আফগানিস্থানে পাঠাইয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

আক্‌মল খাঁ নামে একটা লোক তখন পাহাড়ে আফগানদের রাজা বলিয়া নাম জাহির করিয়াছেন, আর স্বাধীন রাজার মত নিজের নামে টাকা-পয়সা চালাইতেছেন। তিনি আওরংজীব বাদশার কোন ধারই ধারিতে চাহেন না। স্বাধীনতার নামে দেশের বহু লোক তাঁহার পাশে জড় হইয়াছে।

বাদশার এই অপমান আমীর খাঁর আর বরদাস্ত হইল না। তিনি কোমর বাঁধিয়া যুদ্ধে নামিলেন, প্রাণপণ করিয়া শত্রুকে নাশ করিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু সব বৃথা হইল। পাহাড়ে শত্রুদের শরীর যেন পাথরের মত শক্ত, তাহারা সব

একজোট হইয়া যুদ্ধে নামিলে কি আর তাহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিবার জো আছে?. লড়াইয়ে সে-বার আমীর খাঁর হার হইল। হউক হার, আমীর খাঁ তবু পিছপাও হইবার পাত্র নন। তিনি ঘরে ফিরিয়া মনে মনে ফন্দি আঁটিতে লাগিলেন। তলোয়ারে তো হার হইল, কিন্তু ঘটে তাঁহার যে বুদ্ধি আছে, সে যে তলোয়ারের চেয়েও ধারালো! আমীর খাঁ ভাবিলেন, বুদ্ধিতে যদি ব্যাটাদের হার মানাইতে না পারি, তবে বৃথাই আমি বাদশার সাগরেদ।

আমীর খাঁ পরাজয়ের অপমান ঘাড় হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া আফগানদের সঙ্গে ভাব করিবার ফিকির খুঁজিতে লাগিলেন। আফগানরা সভ্যতা-ভব্যতার ধার বড়-একটা ধারে না—কাহারও সঙ্গে সহজে মেলামেশা করিতে নারাজ। কিন্তু খাঁ-সাহেব তাহাদের সঙ্গে এমনি আপনজনের মত ব্যবহার সুরু করিয়া দিলেন যে, শেষে তাহারা তাঁহার সঙ্গে না মিশিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার পর কিছু দিনের মধ্যেই সাপুড়ের হাতের সাপের মত আফগানরা আমীর খাঁর বাধ্য হইয়া উঠিল—দলে দলে আমীর খাঁর সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে লাগিল। আমীর খাঁ যে আওরংজীব বাদশার লোক —পরম শত্রু, সে কথা তাহারা একেবারেই ভুলিয়া গিয়া, তাঁহাকে পরম হিতৈষী বন্ধু বলিয়া জানিল।

আফগানদের দলপতি আক্‌মল খাঁও আবার তেমনি সেয়ানা। আওরংজীব বাদশার লোক দেশের মধ্যে এখনও

বেশ চুপচাপ বসিয়া আছে—হার মানিয়াও পলাইয়া যায় নাই! আবার দেশের লোকদের হাত করিতে চায়। মতলব তো ভাল নয়; এ লোককে দেশ-ছাড়া করিতে না পারিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতেছে না।

পাহাড়ে পাহাড়ে আফগানদের নানা গোষ্ঠী, নানা ঘর। ঝট্‌পট্ আসিয়া আক্‌মল খাঁর সঙ্গে জুটিবার জন্য তাহাদের সকলের তলব হইল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর লড়াইয়ের নামে আফগানরা জোয়ারের জলের মত নাচিয়া ফুলিয়া উঠে। দেখিতে দেখিতে ঢাল-তলোয়ার, বন্দুক-বর্শা লইয়া যোদ্ধারা সব ছুটিয়া চলিল।

সুবাদার আমীর খাঁ দেখিলেন, গতিক বড় মন্দ। আফগানরা যে ক্রমেই দলে ভাবী হইতেছে। একবার তো যুদ্ধ করিয়া হার হইয়াছে; লোকজনও বড় কম সাবাড় হয় নাই। আবার যদি জোট বাঁধিয়া ব্যাটারা হুড়মুড় করিয়া ঘাড়ের উপর পড়ে, তাহা হইলে কি হইবে কে জানে! আমীর খাঁর এক জন খুব হুঁশিয়ার চালাক কর্ম্মচারী ছিল; নাম তাহার—আব্‌দুল্লা। আমীর খাঁ তাহার সঙ্গে পরামর্শ আঁটিতে বসিয়া গেলেন। অনেক পরামর্শের পর মতলব ঠিক হইলে আব্‌দুল্লা এক মজার কাণ্ড করিলেন;—তিনি আফগানদের এক-এক গোষ্ঠীর সর্দ্দারদের তাঁবুতে এক-একখানা চিঠি পাঠাইলেন। সব চিঠিতেই এই কয়টি কথা লেখা ছিল:—

"আফগানরাই এ দেশের মালিক। তাদের দেশ তারাই শাসন করে, ইহাই তো আমরা চাই। খোদাকে ধন্যবাদ, আমাদের সেই আশা বুঝি বা এত দিনে ফলিল! তবে এর মধ্যে একটা কথা আছে। সে কথাটা সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। যিনি আফগানিস্থানের রাজা, তিনি কেমন-ধারা লোক তা আমাদের জানা নাই। রাজ্য চালাইবার গুণ যদি ষোল আনা তাঁহার থাকে, তবে পত্রপাঠ আমাদের জানাইবে। আমরাও সকলে তাঁহার দলে গিয়া জুটিব; মোগল-বাদশা আওরংজীবের চাকরিতে আমাদের অরুচি হইয়াছে।"

চিঠি পড়িয়া আফগান-সর্দ্দারদের ফুর্ত্তি দেখে কে! বিনা যুদ্ধেই কেল্লা ফতে! শুধু তাই নয়, শত্রুপক্ষের লোক আসিয়া দল ভারী করিতে চায়। তারা তখনই উৎসাহের সঙ্গে চিঠির জবাব দিল; লিখিল—এমন গুণের রাজা আর হয় নাই, বুঝি বা আর হইবেও না।

এই চিঠি পাইয়া আব্‌দুল্লা আবার লিখিয়া জানাইলেন—"তোমাদের মুখে রাজার গুণের কথা শুনিয়া মনে খুব ভরসা হইল। আরও ভরসা হয়, যদি তোমরা রাজার গুণের একটা পরীক্ষা লও। যে-সব জায়গা রাজা তোমাদের সাহায্যে আগেই জয় করিয়াছেন, রাজা খুব গুণী খুব যোগ্য হইলে সে-সব জায়গা কখনও একলা ভোগ করিতে চাহিবেন না। তোমরা সেই সব জায়গা তোমাদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া দিতে বল—দেখি, তোমাদের রাজা কি করেন।"

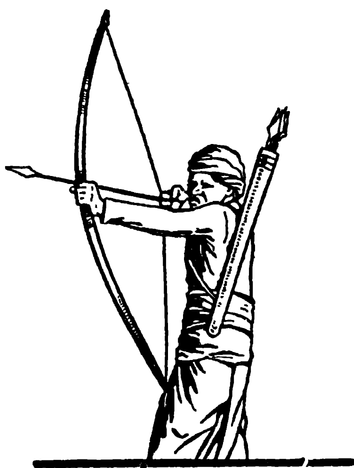
আফগান-সর্দ্দাররা ভাবিল, কথাটা মন্দ নয়। একবার যাচাই করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি? তাহারা তখন সব একমত হইয়া আক্‌মলের কাছে জমির ভাগ চাহিয়া বসিল।

আক্‌মলের মহা বিপদ! অল্পস্বল্প জমি দখলে আসিয়াছে। সেটুকু অতগুলি সর্দ্দারের মধ্যে কেমন করিয়া ভাগ করিয়া দেওয়া চলে? মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "সে কি ক'রে হবে?"

কি ক'রে হবে!—সর্দ্দাররা রাগে একেবারে আগুন হইয়া উঠিল। তাহারা প্রাণ দিয়া, দেহের রক্ত দিয়া জমি জয় করিয়া দিবে, আর তাহা ভাগ করিয়া দিবার কথা উঠিলেই যত আপত্তি! এই তাহাদের গুণের রাজা? ইহারই জন্য তাহারা লড়াই করিতে যাইতেছিল! ভাগ্যে আব্‌দুল্লা তাহাদের পরখ করিতে বলিয়াছিল! তাহারা তখনি যে যাহার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল।

আক্‌মল বেগতিক দেখিয়া জমি ভাগ করিয়া দিলেন। কিন্তু তখন সর্দ্দারদের মন ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহার উপর ভাগের সময় আক্‌মল নিজের গোষ্ঠীর যে-সব আফগান, তাহাদের ভাগ একটু বেশী করিয়া বাঁটিলেন। আর যায় কোথা! হিংসার আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নিজেদের মধ্যে তখন হাতাহাতি খুনোখুনি হইবার জোগাড়। কিছুক্ষণ রোখারুখি করিয়া শেষে যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল।

ইহার পর আফগানরা আর কোনও গোল করে নাই, কাহাকেও আর নূতন রাজা বলিয়া মানে নাই। বুদ্ধির বল যে তলোয়ারের বলের চেয়েও বড়, এই ঘটনায় তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। আমীর খাঁর এই বুদ্ধির খেলায় এত দূর কাজ হইয়াছিল যে, এক আধ বছর নয়, বাইশটি বছর তিনি নির্ব্বিবাদে কাবুল শাসন করিয়াছিলেন। আফগানদের তিনি এমনি বশ করিয়াছিলেন যে, তাহারা ঘরোয়া বিবাদ মিটাইবার দরকার হইলে আগে তাঁহার পরামর্শ লইতে আসিত। আমীর খাঁ তাহাদের এমন সব মতলব বাতলাইয়া দিতেন যে, তাহারা নিজেরা নিজেরা কাটাকাটি করিয়া মরিত, তাহাদের কেহ আর মোগলদের কোনও রকম বেগ দিত না।



বুদ্ধির বল

আমীর খাঁকে আফগানিস্থানের শাসনকর্ত্তা করিয়া ও-রাজ্যটার সম্বন্ধে বাদশা আওরংজীব খুব নিশ্চিন্ত ছিলেন। দুর্দ্দান্ত লড়াইওয়ালা আফগানরা আমীর খাঁর হাতে যেন খেলার পুতুল বনিয়া গিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে যেমন নাচাইতেন, তাহারা তেমনি নাচিত; আর তিনি মনের সুখে দেশ-শাসন করিতেন। এই জন্য বাদশা আওরংজীব যখন-তখন আমীর খাঁর বুদ্ধির তারিফ করিতেন। হঠাৎ একদিন রাত্রে কাবুল হইতে খবর আসিল, আমীর খাঁ মারা গিয়াছেন। খবর শুনিয়া বাদশার তো একেবারে মাথায় হাত! তখনি পরামর্শের জন্য আরশাদ্ খাঁর ডাক পড়িল। আরশাদ্ খাঁ এক সময়ে আফগানিস্থানের দেওয়ান ছিলেন। বাদশা বলিলেন, "আরশাদ্, বড়ই ভাবনার কথা। আমীর খাঁ মারা গেছে, এখন উপায়? আফগানরা যে রকম অশান্ত দুর্দ্দান্ত লোক, তাতে আমীর খাঁর জায়গায় লোক পাঠাবার আগেই হয়ত তারা সেখানে একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলবে!"—বলিয়া বাদশা একখানা চিঠি আরশাদ্ খাঁর সামনে ফেলিয়া দিলেন।

এই চিঠিতে আমীর খাঁর মৃত্যুর খবর ছিল। আরশাদ্ চিঠি পড়িয়া বলিলেন, "আমীর খাঁ মারা গেছেন এটা অবশ্য ভাল খবর নয়, কিন্তু তাতে ভয়ের কারণ নেই জনাব। তাঁর স্ত্রী সাহিবজী এখনও বেঁচে। জনাব কি জানেন না যে, আফগানিস্থানের সত্যিকার সুবাদার আমীর খাঁ নন, তাঁর স্ত্রী সাহিবজী?"

আরশাদ্ খাঁ এতটুকু মিথ্যা বলেন নাই। আমীর খাঁর স্ত্রীর মত চালাক-চতুর মেয়ে খুব কমই দেখা যায়। খাঁ-সাহেব কোন রকম গোলে পড়িলেই আগে গিয়া স্ত্রীর পরামর্শ লইতেন। সাহিবজীর মন্ত্রণার জোরেই আমীর খাঁ অনেক সময় বিপদ-আপদের হাত হইতে বাঁচিয়া যাইতেন। সাহিবজী বাপের উপযুক্ত বেটী। তাঁহার বাপ আলিমর্দ্দান খাঁ এক জন মস্তবড় লোক, আওরংজীব বাদশার বাপ—বাদশা শাজাহানের দরবারের তিনি ছিলেন সব চেয়ে বড় ওমরা।

সাহিবজী একবার দিল্লী শহরের উপরেই তাঁহার উপস্থিত-বুদ্ধি ও সাহসের পরিচয় দিয়া সকলকে অবাক করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি চৌদোলে চড়িয়া শহরের এক গলির ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় বাদশার একটা ক্ষেপা হাতী তাঁহার সামনে আসিয়া পড়ে। সাহিবজীর লোকজন হাতীটাকে ফিরাইয়া দিবার অনেক চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু হাতীর মাহুতটা ছিল ভারি বদমায়েশ; তাহার উপর আবার সে খোদ বাদশার মাহুত, কোন কিছুর তোয়াক্কা না রাখিয়া

হাতীটাকে সামনের দিকে চালাইয়া দিল। আর একটু হইলেই হাতীটা চৌদোল আর চৌদোলের বাহকস্মুদ্ধ সাহিবজীকে পায়ের তলায় ফেলিয়া পিষিয়া মারে! বেহারাগুলো চৌদোল ফেলিয়া দে ছুট! মুসলমান মেয়েছেলেদের বাহিরের কাহাকেও মুখ দেখাইতে নাই; সাহিবজী তাই কাপড়ের উপর কাপড়, তাহার উপর কাপড় দিয়া নিজেকে বেশ করিয়া ঢাকিয়া বসিয়া ছিলেন। তিনি দেখিলেন, এমন করিয়া বসিয়া থাকিলে এখনি প্রাণটা যাইবে। আর কেহ হইলে অবশ্য লজ্জার খাতিরে চৌদোলের ভিতর বসিয়া বসিয়াই মরিত, কিন্তু সাহিবজী সে রকমের মেয়ে নন, তিনি চকিতে চৌদোল হইতে লাফাইয়া পড়িয়া এক ছুটে সামনের এক পোদ্দারের দোকানে গিয়া উঠিলেন।

তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল; কিন্তু তিনি মুসলমান-সমাজের কাছে একটা ভয়ানক অন্যায় ও দুঃসাহসের কাজ করিয়াছেন। শুধু যে লোকে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছে তাহাই নয়, তিনি ভিতর হইতে বাহির হইয়া দশের চোখের সামনে পড়িয়াছেন। আমীর খাঁ স্ত্রীর উপর ভয়ানক চটিয়া গেলেন; এমন কি স্ত্রীর সঙ্গে তাঁহার একরকম ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। দিনকতক পরে কথাটা বাদশা আওরংজীবের বাপ—শাজাহানের কানে উঠে। তিনি আমীর খাঁকে ডাকিয়া বলিয়া দেন—'সাহিবজী তো পর্দ্দার ভিতর থেকে বেরিয়ে ভাল কাজই করেছে। তাতে ক'রে সে তো নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছেই—সঙ্গে সঙ্গে

তোমার মানও বাঁচিয়েছে। পাগলা হাতীটা যদি তাকে শুঁড়ে ক'রে জড়িয়ে ধ'রে পথের মাঝখানে ফেলে দিত, তখন কোথায় থাকতো পর্দ্দার বড়াই, আর কোথায় থাকতো তোমার মান?' আমীর খাঁ কথাটা তলাইয়া বুঝিলেন। তাই আবার স্ত্রীর সঙ্গে ভাব করিলেন।

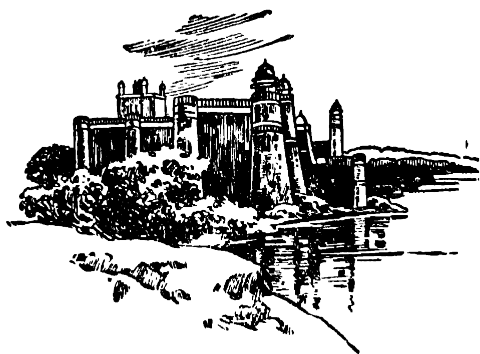
এই ঘটনার কথা যে আওরংজীব বাদশার জানা না-ছিল তাহা নয়, তাহার উপর আরশাদ্ খাঁর মুখে সাহিবজীর প্রশংসা শুনিয়া তিনি অনেকটা ভরসা পাইলেন। তখনি সাহিবজীকে লিখিয়া জানাইলেন যে, যত দিন না আমীর খাঁর জায়গায় নূতন সুবাদার পাঠানো হয়, তত দিন আফগানিস্থানের শাসনভার তাঁহারই উপর।

আমীর খাঁ হঠাৎ মারা যান। সাহিবজী যে সহজেই কাবুল শাসন করিতে পারিবেন, তাহার পরিচয় তিনি স্বামীর মৃত্যুর দিনই দিয়াছিলেন। সময়ে সে খবর বাদশার কানে আসিল। বাদশা শুনিয়া যে খুব খুশী হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমীর খাঁ লোকলস্কর লইয়া একটা কাজের জন্য উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় পথের মাঝে তাঁহার মৃত্যু হয়। সাহিবজী সে সময় তাঁহার সঙ্গে। তিনি দেখিলেন, মহা বিপদ উপস্থিত! আমীর খাঁর জন্যই এত কাল দাঙ্গাবাজ আফগানরা মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া আছে। আজ যদি ফস্ করিয়া তাঁহার মৃত্যুর খবর কোন রকমে তাহাদের কানে গিয়া পৌঁছায়, তাহা হইলে কি

আর রক্ষা আছে! আফগানরা ক্ষেপিয়া উঠিবে, আর সেই সরু পাহাড়ে-রাস্তায় তাঁহাদের আটক করিয়া হয়ত এখনি কচুকাটা করিবে—আওরংজীব বাদশার এই রাজ্যটুকু এত দিনে তাঁহার হাত হইতে খসিয়া যাইবে। সাহিবজীর আর স্বামীর জন্য শোক করা হইল না, মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিয়া চোখের জল মুছিয়া বুদ্ধির খেলা খেলিতে বসিয়া গেলেন। চতুরা সাহিবজী একটা লোককে আমীর খাঁর মত সাজগোজ করাইয়া, পাল্কির মধ্যে বসাইয়া পথ চলিবার হুকুম দিলেন। সবাই মনে করিল, পাল্কি করিয়া আমীর খাঁ ঘরে ফিরিতেছে। তিনি যে মারা গিয়াছেন, তাহা কেহ বুঝিতেই পারিল না।

আমীর খাঁর মৃত্যুর কথা তাহার পর যখন আফগান-সর্দ্দারদের কানে পৌছিল, সাহিবজী তখন রাজ্যের আটঘাট বাঁধিয়া স্বামীর আসনে বসিয়াছেন। আফগানরা মাথা তুলিবার সাহস করিল না, বরং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাঁহার কাছে আত্মীয়স্বজনদের পাঠাইয়া দিল। সাহিবজী তাহাদের খুব খাতির-যত্ন করিলেন, আর বিদায় দিবার সময় তাহাদের দিয়া সর্দ্দারদের জানাইয়া দিলেন—'তোমাদের পাওনা-গণ্ডা ঠিকমত পাবে। কিন্তু খবরদার! লড়াই করতে এসো না, এলে ভাল হবে না কিন্তু। আর লড়াই যদি একান্তই করতে চাও তো আর দেরি করবার দরকার নেই, এখনি অস্ত্র ধর—দেখা যাক, কে হারে, কে জেতে!'—কথা শুনিয়া সবাই মাথা নীচু করিয়া রহিল, কেহ কোন কথা কহিল না।

সাহিবজী ইহার পর দুই বৎসর আফগানিস্থান শাসন করিলেন। আফগানরা তাঁহার খুব বাধ্য ছিল। স্বামীর জায়গায় নূতন সুবাদার আসিল; সাহিবজীও ছুটি পাইলেন। কিন্তু সংসারে আর তাঁহার মন টিকিল না। সংসারের সকল সাধ তো স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ফুরাইয়া গিয়াছে! বাদশার অনুরোধেই কেবল এত দিন অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজকার্য্য লইয়া পড়িয়া ছিলেন। এইবার শেষের দিনগুলি আল্লার নাম করিয়া কাটাইবার জন্য তিনি মুসলমানের মহাতীর্থ মক্কায় যাওয়া স্থির করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি খোদার নামগান করিতে, আর দুই হাতে মনের সাধে দীনদুঃখীদের মধ্যে দান-খয়রাৎ করিয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদ কুড়াইতে লাগিলেন।



বাদশার নেকনজর

পঞ্জাবের হাসান-আব্‌দাল শহরে বাদশা আওরংজীবের একখানা মস্তবড় বাগান-বাড়ী ছিল। এই বাড়ীর বাগানের ভিতর দিয়া জল বাহির হইয়া তোড়ে নীচের একটা নালায় পড়িত। সেই নালার মুখে এক বুড়ো জাঁতাকল বসাইয়াছিল। বাগানের জল সজোরে জাঁতাব উপর পড়িলেই উহা ঘুরিত, সঙ্গে সঙ্গে গম পেষাই হইয়া ময়দা বাহির হইত। সেই ময়দা বেচিয়া অতিকষ্টে কাচ্চাবাচ্চা লইয়া বুড়োর দিন গুজরান হইত।

হাসান-আব্‌দাল জায়গাটা পাহাড়ে, কাজেই গ্রীষ্মকালেও খুব ঠাণ্ডা। রাজধানী দিল্লী খুব গরম জায়গা, আওরংজীব বাদশা তাই এ সময়ে মাঝে মাঝে সদল-বলে এখানে হাওয়া বদলাইতে আসিতেন। সে-বার বাদশা আসার পর তাঁহার চাকর-বাকরেরা, কি জানি কেন, যেখান দিয়া বাগান-বাড়ীর জল বাহির হইয়া নালায় পড়িত তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। জলও আর নালায় পড়ে না, বুড়োর ময়দার জাঁতাও আর

ঘোরে না। শেষে বুড়োর পেট চলা দায়, ছেলেমেয়ে লইয়া সে বড়ই মুশকিলে পড়িল।

বখ্‌তাওর খাঁ আওরংজীব বাদশার এক জন বড় কর্ম্মচারী। বুড়োর কষ্টের কথা এক দিন তাঁহার কানে গেল। তিনি সেই দিনই সন্ধ্যার সময় কথায় কথায় বুড়োর অবস্থা বাদশাকে জানাইলেন। আওরংজীব বাদশা নিজে গোঁড়া মুসলমান, মুসলমান প্রজার উপর দরদ তাঁহার সব চাইতে বেশী। যখন তিনি শুনিলেন বুড়ো ময়দাওয়ালা এক জন মুসলমান—তাঁহারই চাকর-বাকরের দোষে অনাহারে মর-মর, তাঁহার যা কষ্ট হইল সে আর কি বলিব? বাদশার মনটা এমন খারাপ হইয়া গেল যে, রাত্রে বিছানায় শুইয়াও তিনি ঘুমাইতে পারিলেন না। ভাবিতে লাগিলেন, তিনি তো রাজভোগ খাইয়া তোফা আরামে বিছানায় গড়াইতেছেন, সে বুড়ো বেচারীর হয়ত আজ একবেলা এক মুঠা আহারও জুটে নাই, পেটের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিতেছে। বাদশা আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না, তখনি বিছানা ছাড়িয়া বখ্‌তাওর খাঁকে ডাকাইয়া বলিলেন, "এখনি দু-থালা ভাল ভাল খাবার, আর পাঁচটা সোনার মোহর বুড়োর বাড়ী পৌঁছে দিতে হবে।"

বখ্‌তাওর খাঁ আবার বুড়োর ঠিকানা জানিতেন না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক পেয়াদার কাছে সন্ধান পাইলেন যে, পাহাড়ের উপরে ছোট্ট এক কুঁড়েঘরে বুড়ো বাস করে। একটা লোকের হাতে খাবারের থালা দিয়া বখ্‌তাওর তাহার

সঙ্গে চলিলেন—বুড়োর উদ্দেশে। রাত্রে বুড়োর চোখেও ঘুম ছিল না। তাহার ময়দার কল বন্ধ হওয়ায় একটি পয়সাও আয় নাই। কাচ্চাবাচ্চা লইয়া ওখানে পড়িয়া থাকিলে যে অনাহারে মরিতে হইবে, তাহাও ঠিক। এ বয়সে বুড়োর আর নূতন কিছু করিবারও উপায় নাই। কি করিবে, কোথায় যাইবে—ভাবিয়া যে আর কূলকিনারা পাইতেছে না। এমন সময় বখ্‌তাওর খাঁ ও তাঁহার সঙ্গী বুড়োর বাড়ীতে গিয়া হাজির। তাঁহারা যখন সেই খাবারের থালা ও মোহরগুলি বাদশার খয়রাৎ বলিয়া তাহার সামনে ধরিলেন, তখন বুড়ো আনন্দের বেগ সামলাইতে না পারিয়া একেবারে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

পরের দিন বুড়োর দুয়ারে বাদশার পাল্কি আসিয়া হাজির! তাহাকে এখনি রাজবাড়ীতে যাইতে হইবে—বাদশার তলব। পাল্কির গায়ে কত রঙ-বেরঙের ছবি, মকরমুখো রুপার ডাণ্ডিতে সোনার চোখ জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে। বুড়ো তো জীবনে এমন পাল্কি কখনও চোখে দেখে নাই—পাল্কিকে সে কুর্নিশ করিবে, না, আর কিছু করিবে কিছুই ভাবিয়া পায় না। শেষে লোকজনদের কথায় সে পাল্কিতে চড়িয়া বসিল।

বুড়োকে দেখিয়া বাদশা খুব খুশী হইলেন, আদর করিয়া তাহার ঘর-সংসারের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আছে না-আছে তাহার খোঁজ লইলেন।

খোদ শাহানশা বাদশার সামনে আসিয়া দাঁড়াইবে, বুড়ো কখনও মনেও করিতে পারে নাই। তাহার হাত কাঁপে, পা কাঁপে, গলা শুকাইয়া কাঠ হয়, মুখ দিয়া কিছুতেই কথা বাহির হয় না।

বাদশা তাহাকে ভরসা দিয়া ঠাণ্ডা করিলে হাতজোড় করিয়া সে অতিকষ্টে ঘর-সংসারের হাল জানাইয়া বলিল যে, সংসারে তাহার এক স্ত্রী, দুইটি ছেলে ও দুইটি আইবুড়ো মেয়ে। বাদশা দেখিলেন, সংসারে বুড়ো একলা নয়। অনেকগুলি পোষ্য লইয়া সে বেকার হইয়া পড়িয়াছে। লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "চাকর-বাকরদের দোষেই তোমাকে এত কষ্টে পড়তে হয়েছে। তুমি আমার প্রতিবেশী, তোমার দুঃখ দূর করাই আমার কর্ত্তব্য, তা না ক'রে আমি যে তোমার দুঃখের কারণ হয়েছি সেজন্য আমি দুঃখিত।" বাদশা বুড়োকে নগদ দু-শো টাকা দিলেন, অন্দরের বেগমরাও অনেক টাকা-পয়সা, গহনাগাঁটি, কাপড়-চোপড় দান করিলেন। দুই দিন রাজার হালে রাজবাড়ীতে কাটাইয়া, বুড়ো ঘরে ফিরিবার জন্য পাল্কিতে উঠিল। বুড়ো তখন আর সে বুড়ো নাই—একেবারে নতুন মানুষ। গায়ে তার শাল, কিংখাবের পায়জামা, জামায় আবার জরির কত কাজ, মাথায় বাহারে টুপি, গায়ে আতর-গোলাবের খোশবায়! ঐ বেশে সে যখন বাড়ী পৌঁছিল, তখন তাহার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা তাহাকে চিনিতেই পারে না। তাহার পর একটু ঠাহর করিয়া দেখিয়া

তাহাকে যখন চিনিল, তখন আর তাহাদের আনন্দ দেখে কে?

দিন দুই-তিন পরে আবার বাদশার পাল্কি বুড়ো ও তাহার মেয়েদের লইতে আসিল। পয়সার অভাবে এত দিন আইবুড়ো মেয়ে দুটির বিবাহ হইতেছিল না। বাদশা তাহাদের বিবাহের জন্য বুড়োকে হাজার টাকা দিলেন। বেগমরা গহনাগাঁটি, পোশাক-আশাক, আরও কত কি দিলেন। বয়সের দরুন বুড়োর মুখের মাংস ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। চোখ দুইটিও যাইবার দাখিল। বাদশা নিজের হকিম পাঠাইয়া বুড়োর চোখের চিকিৎসা করাইলেন। আবার তাহার ছেলে দুইটিও বাদশার দেওয়া অনেক রকম দামী জুতা জামায়, জরির তাজে ক্ষুদে নবাব সাজিয়া মনের সুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বুড়োর ময়দার জাঁতা আবার আগের মতই ঘুরিতে লাগিল। বাদশা বুড়োর আরও একটা জাঁতা বসাইয়া দিলেন। জাঁতা ঘুরাইবার জন্য সরকারী বাগান হইতে আরও বেশী করিয়া জল যোগানো হইতে লাগিল।

বাদশা আওরংজীব তাঁহার চাকর-বাকরদের উপর কড়া হুকুম জারি করিলেন—এবার যদি বাগানের জলের অভাবে বুড়োর ময়দার কল চলা বন্ধ হয়, তবে তিনি কাহারও ঘাড়ে মাথা রাখিবেন না।



অদল বদল

মোগল বাদশাদের ধনদৌলত আর বিলাসিতার কথা শুনিলে মনে হয়, সে যেন সত্য নয়—ঠাকুমাব মুখের আজগবী রূপকথা। সেই আশ্চর্য্য কোহিনূর-মণি, যার আভায় আঁধার ঘর আলো হয়, যার মত সুন্দর বড় আর দামী মণি দুনিয়ায় আর একটিও নাই, সেই মণি তাঁদেরই ঘর আলো করিত। আরও একটি আশ্চর্য্য জিনিস তাঁদের দরবারের শোভা বাড়াইত, তার নাম ময়ূর-সিংহাসন। সেটা সোনায় গড়া; তার গায় যেখানে যেমনটি সাজে, তেম্‌নি সব দামী দামী মণিমুক্তা বসানো। আভায় তার চোখ ঝলসিয়া যাইত, তবু ইচ্ছা করিত, কেবল তার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকি। কত বড় ওস্তাদ কারিগরেরা যে তা গড়িয়াছিল, বলিতে পারি না। আর ঐ আসনটা গড়িয়া দিতে তারা কম টাকাও লয়

নাই। যাই হোক, তাদের সেই মজুরির টাকাটা ছাড়িয়া দিলেও, শুধু এই সিংহাসনের হীরা জহরৎ-আদির দামই হইবে ক্রোর টাকা। মোগল বাদশারা এই মজার ময়ূরের আসনের উপরে কার্ত্তিক ঠাকুরের মত বাবু হইয়া বসিয়া গোঁফে চাড়া দিতেন, আর দরবার করিতেন। সেই বাদশাহী দরবার একটা দেখিবার মত জিনিস ছিল।

এত ধনদৌলত আর আসবাবপত্রের কথা শুনিলে তার উপরে লোভ না হয় কা'র? আর যে-সব লোকের তা কাড়িয়া লওয়ার ক্ষমতা আছে, তাদের তো কথাই নাই। দেশ-বিদেশের সেই রকম সব লুঠে লড়াইওয়ালারা, মোগলদের ঐ-সব বিলাসের ঠাটের কথা শুনিয়া ধড়ফড় করিয়া মরিত। এঁরা যে শুধু ধনদৌলতের বাদশা, তা নয়—বীরের বাদশাও। আওরংজীবের আমল পর্য্যন্ত, কয় পুরুষ এঁরা এমনি দাপটে রাজ্য চালাইয়াছিলেন যে, সেখানে কাহারও মাথা গলাইবার জো ছিল না। তাঁদের নামে বাঘে-গরুতে একই ঘাটে জল খাইত। কিন্তু আওরংজীবও চোখ বুজিলেন, আর রাজ্যেও ভাঙ্গন ধরিল। শুধু মোগল-রাজ্য বলিয়া নয়, দুনিয়ার নিয়মই এই—আজ যে রাজা, কাল সে প্রজা—চিরদিন কাহারও সমান যায় না। অনেক দিন এ দেশের গরম হাওয়ায় বাস করিয়া দাসী-নফরের সেবা পাইয়া, বিলাসের উপরে বিলাস করিয়া, সিংহের মত তেজী যে মোগল, সে যেন ভেড়া বনিয়া খোঁয়াড়ে ঢুকিল। এত বড় যে সোনার রাজ্য, কোথা হইতে কে

ভাঙিয়া-চুরিয়া লুঠিয়া লইল, তার ঠিক নাই। কিসেরই বা রাজ্য, আর কিসেরই বা কি! বাদশারা অন্দরে থাকিয়া নাকে তেল দিয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমান।

নাদির শা বুঝিলেন, পোয়াবারো। এ সময়টা একবার দিল্লীতে গিয়া হানা দিতে পারিলেই, বাস্, 'কেল্লা একদম ফতে,' সারাজীবনে আর কিছু না করিলেও চলিয়া যাইবে। নাদির লোকটা খুব উদ্যোগী, সামান্য অবস্থা হইতে নিজের চেষ্টা-যত্নে পারস্যের 'শা' হইয়াছিলেন। মানুষ যত পায়, তত চায়। সোনার ভারতের সোনার উপর নাদিরের লোভ হইল। মোগল বাদশাদের কত কালের কত ধনদৌলত যে দিল্লীতে জমিয়া স্তূপাকার হইয়া আছে, তার ঠিক নাই। সেগুলো হাত করিতে না পারিলে তিনি কিসের শা? তখনই সৈন্য-সামন্ত লইয়া ছুটিলেন—এই ভারতের দিকে।

মহম্মদ শা তখন মোগলের ভাঙা হাটের মেকি বাদশা। নাদিরের নাম শুনিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল।

রাজসরকারে বেশী সৈন্য মজুত নাই। কেহ মাহিনা পায়, কেহ পায় না। অনেক দিন যুদ্ধ না করিয়া তাহাদের তলোয়ারে মরিচা ধরিয়াছে, ঢাল খাবারের ঠোঙা হইয়াছে। তাহারা ঘরোয়া বিবাদ লইয়া যত ব্যস্ত, বাইরের লড়াইয়ের জন্য ততটা ব্যস্ত নয়। যুদ্ধ হইল না। নাদির বিনা-বাধায় দিল্লীতে আসিয়া তাঁবু গাড়িলেন। মহম্মদ শা ঘরে থাকিয়া

এত দিন নাদিরের দাপটের কথা শুনিতেছিলেন। এইবার তাঁর লটবহর আর লোকলস্করের ঘটা দেখিয়া একেবারে থ হইয়া গেলেন। তার পর ভাবিয়া-চিন্তিয়া ঠিক করিলেন, এত বড় ভীমরুলের চাকে যে খোঁচা দেয়, তার মত বোকা আর দুনিয়ায় কেউ নাই। খোঁচা তো দিবেনই না, বরং কিছু সেলামি—টাকাকড়ি লইয়া যদি আপদ বিদায় হয়, তো তাহার ব্যবস্থাই করিবেন।

একদিন মহম্মদ শা সুড়সুড় করিয়া নাদির শা'র দরবারে গিয়া সেলাম জানাইয়া কহিলেন, "রক্তারক্তি করিয়া লাভ নাই, আমি আপনাকে খুশী করিয়া দিতেছি, আপনি এখান হইতে সৈন্য সরাইয়া লউন।"

ধনরত্নের জন্যই নাদির আসিয়াছেন, এ দেশে বাদশা হইয়া রাজত্ব করার ইচ্ছা তাঁহার নাই; বলিলেন, "তা বেশ তো। কিন্তু আমার লোকজন-সব পথের কষ্টে কাতর, দিন-সাতেক এখানে থাকিয়া একটু ঠাণ্ডা হইলেই আবার দেশে ফিরিয়া যাইতেছি।"

মহম্মদ শা'র ইহাতে আপত্তি করিবার উপায় নাই, আর করিলেই বা শোনে কে?

নাদির দিল্লীর বুকের উপর চাপিয়া রহিলেন।

অনেক রাত। দিল্লীর পথঘাটে লোক-চলাচল বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। পাহারাওয়ালারা মাঝে মাঝে জোর-গলায় 'খবরদার হো' হাঁকিয়া যাইতেছে। হঠাৎ কেমন করিয়া

রটিয়া গেল যে,—'আপদ চুকিয়াছে; ঐ যে লড়াইওয়ালা নাদির, যার তলোয়ারের মুখে আগুন জ্বলে, যে পারস্য হইতে উড়িয়া আসিয়া তাহাদের রাজধানী জুড়িয়া বসিয়াছে, টাকা-কড়ি পাইয়াও নড়িতে চাহিতেছে না, সে মরিয়াছে—তাদের বাদশা মহম্মদ শা'র লোকেই তাহাকে খুন করিয়াছে!'

খবরটি কিন্তু সত্য নয়, একেবারে ফাঁকা—মিথ্যা। কিন্তু তাহাদের তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। শত্রু খুন হইয়াছে—যেমন-তেমন শত্রু নয়—সেই নামজাদা নাদির শা। নগরের লোকেরা আহ্লাদে পাগল হইয়া উঠিল, আর দল বাঁধিয়া নাদিরের লোকজনের উপর পড়িল—অনেকে খুন-জখম হইল।

নাদির চোখ রাঙাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—'কি, এত দূর সাহস!—আমার লোক খুন! দিল্লীতে কা'র ঘাড়ে ক'টা মাথা আমি দেখিয়া লইতেছি।'

নাদিরের লোকজনেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া হল্লা করিতে করিতে তাঁবু ছাড়িয়া বাহির হইল। যাহাকে সাম্‌নে পাইল, তাহাকেই কাটিয়া কুচি-কুচি করিল। দেখিতে দেখিতে দিল্লীর বুকের উপর রক্তগঙ্গা বহিল। ইহার উপর অগ্নিকাণ্ড—সৈনিকেরা ঘর জ্বালাইয়া গৃহস্থকে পোড়াইয়া মারিতে লাগিল।

নাদির শা তখন একটি মসজিদের উপরে—নিজ লোক-জনের বীরত্ব দেখিতেছিলেন। মহম্মদ শা মসজিদের কাছে

আসিয়া দাঁড়াইলেন। চোখের উপর এত প্রজার হত্যা কি কেউ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে পারে? হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "ক্ষান্ত হোন, লোকজনের অবস্থা যে আর চোখে দেখা যায় না!—মেহেরবাণী করুন।"

খুন-জখম বড় কম হয় নাই। প্রতিশোধ কড়ায়-গণ্ডায় চুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নাদিরের হুকুমে তখন হত্যা থামিল বটে, কিন্তু লুঠপাট আরম্ভ হইল। নাদির যত পারেন ধনদৌলত লইলেন, তাঁর লোকজনেরাও লইল। দিল্লীর লোকদের যারা প্রাণে বাঁচিল, তারা পথের ভিখারী হইল।

দেশে ফিরিবার সময় নাদির মোগলদের সেই মহা জাঁকজমকের আসন—ময়ূর-সিংহাসনটি মহম্মদ শা'র কাছ হইতে আদায় করিয়া লইলেন। তা ছাড়া দামী দামী আরও কত যে হীরা-জহরৎ লইলেন, তাহার তো অন্ত নাই। তবুও মনটা খুঁৎ-খুঁৎ করিতে লাগিল। সবই যেন হইল, কিন্তু সেই যে মস্ত বড় হীরা—কোহিনূরখানা!—যার কথা এত দূর হইতে শুনিয়া তাঁহার মন উতলা হইয়াছিল, সেটা কোথায়? তাহা না পাইলে যে কিছুই হইল না। অমন চীজ্ কি হাত না করিয়া যাওয়া যায়? নাদির অনেক সন্ধানের পর খবর পাইলেন যে, মহম্মদ শা তাঁর মাথার পাগড়ির মধ্যে উহা লুকাইয়া রাখিয়াছেন। নাদিরের দিল্‌টা তখন খুশীতে ভরপূর হইয়া গেল। তিনি তখন বিদায় লইবার জন্য মহম্মদের কাছে উপস্থিত হইলেন। বাদশাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,

"তা হ'লে বিদায়! আজ থেকে আমরা ভাই ভাই। কিন্তু এর একটা নিশানা তো চাই,—এস, আমরা দুজনে পাগড়ি অদল-বদল করি।"

মহম্মদ বুঝিলেন, এইবার কুপোকাৎ! নাদির তাহা হইলে তো হীরাটারও সন্ধান পাইয়াছেন! কিন্তু এখন আর উপায় কি? পাগড়ি গেল, তার সঙ্গে সঙ্গে গেল সেই শোভার শোভা—কোহিনূর!

কিন্তু তখনও কোহিনূর-মণির নাম কোহিনূর ছিল না। পাগড়ি খুলিয়া, আর হীরাখানার জেল্লা দেখিয়া, নাদির আর আহ্লাদ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, একেবারে চেঁচাইয়া উঠিলেন, 'কোহিনূর রে—কোহিনূর, আর কিছু নয় এ—আলোর পাহাড়!' ফার্সীতে 'কোহিনূর' কথার মানে 'আলোর পাহাড়'।

এখন আর সে ময়ূর-সিংহাসন নাই। নাদিরের মৃত্যুর পরে সেটা ভাঙিয়া-চুবিয়া তচ্‌নচ্‌ হইয়া গিয়াছে। টুক্‌রাগুলি কোথা হইতে কোথায় গিয়া যে লোপ পাইয়াছে, তাহার ঠিক নাই। ইস্পাহানে একটা ময়ূর-সিংহাসন আছে বটে, সেটা কিন্তু আসল নয়—নকল।

আর সেই আলোর পাহাড়—কোহিনূর? সেটা নষ্ট হইবার নয়—এখনও আছে; কিন্তু পারস্যে নাই, অনেক হাত ঘুরিয়া, অবশেষে বিলাতে গিয়া ব্রিটিশরাজের ঘর আলো করিতেছে।

ওমরাহের উপস্থিত-বুদ্ধি

নাদির শা আগে ছিলেন সামান্য ঘরের ছেলে—ভেড়া চরাইয়া তাঁহার দিন গুজরান হইত। তিনি ভাবিতেন—আমি কি দশ জনের এক জন হইতে পারি না? চেষ্টা-যত্ন থাকিলে মানুষের বড় হইতে কতক্ষণ? নাদির ভেড়া-চরানো ছাড়িয়া পারস্যের রাজার সেনাদলে ভর্ত্তি হইলেন। অল্প দিনের ভিতরেই ভাল সৈনিক বলিয়া নাদিরের নাম জাহির হইল। ক্রমে নিজের চেষ্টায় তিনি পারস্যের রাজ-সিংহাসন জুড়িয়া বসিলেন, কিন্তু তাহাতেও তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না; আরও ধনদৌলতের জন্য তাঁহার মন ছট্‌ফট করিতে লাগিল।

দিল্লীর বাদশা তখন মহাবিলাসী মহম্মদ শা। কাজের মধ্যে তাঁহার মজা করিয়া নাকে সরিষার তেল দিয়া ঘুমানো আর কাজকর্ম্ম ফেলিয়া নাচগান ফুর্ত্তি হরদম্। রাজ্যের আমীর-ওমরারা আর কি করেন—তাঁহারা ঘরোয়া বিবাদে থাকেন মত্ত। দেশের যখন এই দুর্দ্দশা, তখন নাদির শা

ভাবিলেন—তোফা! এ সময়টা একবার বাজপাখীর মত দিল্লীর উপর হুস্ করিয়া গিয়া পড়িলে ভারি মজা হয় কিন্তু! মোগল-বাদশাদের কত কালের সঞ্চয়-করা ধনদৌলত, মণির সেরা কোহিনূর, তাহার উপর সোনায়-গড়া মণিমুক্তাঘেরা ময়ূর-সিংহাসন—ক্রোর টাকা যার দাম—সবই হাত করা যাইবে। আর এই সুযোগে দেশের বোকা লোকগুলাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে যে, মোগল-বাদশার খোলসটাকেই তাহারা এত দিন ডরাইয়া আসিয়াছে—আসল বাদশা কোন্ কালে অক্কা পাইয়াছে! পালোয়ানের সাজপোশাক-পরা একটা মরা লোককে তাহারা জীয়ন্ত পালোয়ান ভাবিয়াই ভয়ে সারা!

নাদির বুক ফুলাইয়া সেনাসামন্ত কামানবন্দুক লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন—মোগল-বাদশার রাজধানী দিল্লীর দিকে, আর দেখিতে দেখিতে লাহোর পর্য্যন্ত বিনা বাধায় দখল করিয়া লইলেন। মোগলদের বাদশা মহম্মদ শা'র তখন চট্কা ভাঙিল। তিনি ভাবিলেন, এ তো ভাল আপদ জুটিল দেখিতেছি, নাদিরকে এখনি দাবাইতে না পারিলে আর বেশী দিন আরামে নিদ্রা দেওয়া চলিবে না। দিল্লী হইতে কিছু দূরে কর্ণাল নামে একটা জায়গায় নাদিরের সঙ্গে বাদশা মহম্মদ শা'র লড়াই বাধিল। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষ নাদিরের সঙ্গে যুঝিয়া উঠা বিলাসী বাদশার কর্ম্ম নয়। গুড়ুম গুড়ুম—নাদিরের কামান ডাকিতে লাগিল, বন্ বন্ শব্দে তীরন্দাজেরা

মোগল-সৈন্যের উপর তীর বৃষ্টি করিতে লাগিল। বাদশার বহু লোক মরিল। বাকি যাহারা রহিল, নাদির তাহাদের কাহারও লইলেন গর্দ্দান, কাহাকেও বা করিলেন কয়েদ। এমন কি বাদশা মহম্মদ শা'কেও শেষে ঘাড় হেঁট করিয়া নাদিরের তাঁবুতে হাজির হইতে হইল।

দিল্লীতে মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল! নাদির শা—যার সঙ্গে যুদ্ধে বাদশাহী ফৌজ তচ্‌নচ হইয়া গিয়াছে—সেই দুর্দ্দান্ত নাদির শা আসিতেছে! কখন কাহার কি হয়! শহরের লোকেরা তো ভয়েই কাঁটা। এমন সময় নাদির শা বাদশাকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীর কেল্লার মধ্যে ঢুকিলেন।

পরের দিন নাদির শা, আর বাদশা মহম্মদ শা কেল্লার মধ্যে দরবার-ঘর—দেওয়ান-ই-খাসে বসিয়া, দুই জনে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। কফি খাইবার সময় হইয়াছে। কফি দিবার ভার পড়িয়াছে—বাদশার এক জন উঁচুদরের ওমরার উপর।

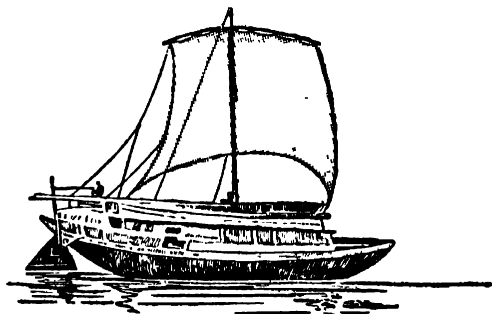
ওমরা যখন সোনার থালায় কফির বাটি বসাইয়া আস্তে আস্তে দরবার-ঘরে ঢুকিলেন, তখন ঘরের লোকজনেরা হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল—ওমরা-সাহেব করেন কি, কাহাকে আগে কফির বাটি দেন! মোগল-বাদশা হইলেন মনিব—তাঁহাকে আগে কফি দিলে অতিথির অপমান করা হইবে, আর অতিথিও বড় যে-সে অতিথি নন,—বাদশার বাদশা! আমীর-ওমরা তো দূরের কথা, খোদ বাদশাও তাঁহার নামে

ডরান। সেই দুর্দ্দান্ত অতিথি অপমান বোধ করিলে কি আর রক্ষা আছে! আবার, অতিথি নাদির শা'কে আগে কফি দিলেও বিপদ—বাদশাকে খাটো করা হইবে, আর তিনি চটিয়া হয়তো তাহার গর্দ্দান লইবেন, না, কি করিবেন, কে বলিতে পারে? নাদির শা তো এ দেশে রাজত্ব করিতে আসেন নাই; আসিয়াছেন ধনদৌলত আত্মসাৎ করিতে। কাজ গুছানো হইলেই দু'দিন পরে দিবেন চম্পট। তখন বাদশার কোপ হইতে বাঁচায় কে?

কাজটা কিন্তু যতই শক্ত হোক না কেন, যে ওমরার উপর কফি দিবার ভার পড়িয়াছিল তিনি ছিলেন খুব চালাক লোক; ঠিক করিলেন, এমন করিয়া কাজটা হাঁসিল করিব, যাহাতে 'সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে!' তিনি ধীর-শান্তভাবে বাদশার কাছে গিয়া বলিলেন, "রাজার রাজা খোদ বাদশার অতিথি—আদরের মানী অতিথিকে কফির বাটি এগিয়ে দেওয়া যে বড় ভাগ্যের কথা। এত বড় কাজের যে গৌরব সেটা আপনারই পাওনা, তা থেকে তো আমি আপনাকে বঞ্চিত করতে পারি না।"

কথা শুনিয়া মহম্মদ শা মহাখুশী হইয়া কফির পেয়ালা ওমরার হাত হইতে নাদিরের হাতে তুলিয়া দিলেন। ওমরার উপস্থিত-বুদ্ধিতে ঘর এবং পর দুই দিকই রক্ষা পাইল। নাদির আর যাহাই হউন—গুণের কদর করিতেন। তিনি হাসিমুখে পেয়ালাটা হাতে লইয়া ওমরার দিকে লক্ষ্য করিয়া

বাদশাকে বলিলেন, "ভায়া হে, তোমার আর সব কর্ম্মচারীরা যদি এই ওমরাটির মত নিজের কর্ত্তব্য পালন করতে জান্‌ত তা হ'লে—জোর ক'রে বলতে পারি—আমাকে বা আমার লালটুপিওয়ালা 'কিজিলবাশী' সৈন্যদের দিল্লীতে দেখতে পেতে না। যদি নিজের ভাল করতে চাও, এ রকম লোক যত পার বাহাল কর!"



জালিম সিংহের মাঠ

বাংলার নবাব সরফ্‌রাজ খাঁর সঙ্গে বিহারের শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দী খাঁর বিবাদ বাধিয়া উঠিল।

আলিবর্দ্দী আর হাজী আহম্মদ দুই ভাই, খুব বুদ্ধিমান আর কাজের লোক। সরফ্‌রাজের পিতা নবাব শুজা খাঁ হাজীকে নিজের মন্ত্রী আর আলীবর্দ্দীকে বিহারের শাসনকর্ত্তার কাজে বহাল করেন। শুজা নিজেও ছিলেন ভাল লোক, মন্ত্রীও পাইয়াছিলেন ভাল। প্রজারা তাঁহার আমলে খুব সুখে-শান্তিতে দিন কাটাইতেছিল। শুজার পুত্র সরফ্‌রাজ বাংলার নবাবি পাইয়া ভাবি সরফ্‌রাজি আরম্ভ করিয়া দিলেন। দেশের যাঁহারা মাথা, যাঁহাদের লইয়া নবাবের নবাবি, সেই-সব বড় বড় জমিদারদের তিনি চটাইয়া দিলেন, আর মন্ত্রী হাজীকে করিলেন বরখাস্ত। শুধু মন্ত্রীকে বরখাস্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না—তাঁহার যে-সব আত্মীয় নবাব-সরকারে চাকরি করিত, তাহাদের উপরেও অত্যাচার সুরু করিলেন। দেখিতে দেখিতে দেশের মধ্যে অশান্তির আগুন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তখন দেশের অসন্তুষ্ট লোকেরা সব একজোট হইয়া

আলিবর্দ্দীকে জানাইলেন—'নবাব সরফ্‌রাজের সরফ্‌রাজিতে বাংলা দেশটা ছারেখারে গেল, আপনি আসিয়া যদি ইহার বিহিত করেন, সিংহাসন কাড়িয়া লন, তবে সব দিক রক্ষা হয়। যদি আমাদের কথায় আপনি রাজী হন, আমরা আপনাকে টাকা দিয়া লোকলস্কর দিয়া সাহায্য করিব।'

বিহারে বসিয়া আলিবর্দ্দী এ দেশের সকল খবরই রাখিতেন। ভাইকে বরখাস্ত, আত্মীয়স্বজনদের উপর অত্যাচার করার কথা তাঁহার কানে আগেই পৌঁছিয়াছিল। তিনি আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। সরফ্‌রাজের রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদে। আলিবর্দ্দী সৈন্যসামন্ত লইয়া সেই দিকে চলিলেন।

মুর্শিদাবাদের পনর ক্রোশ উত্তরে একটা খুব বড় ময়দান আছে—নাম তার গিরিয়ার মাঠ। এই মাঠে আলিবর্দ্দীর সৈন্যের সঙ্গে নবাব সরফ্‌রাজের সৈন্যের লড়াই বাধিল। লড়াই ক্রমেই ঘোরতর হইয়া উঠিল। সরফ্‌রাজের লোক-লস্কর হাতী-ঘোড়া বড় কম ছিল না, কিন্তু তাঁহার শত্রু ছিল ঢের, তাহার উপর তলে তলে এ দেশের অনেক বড় বড় লোক ছিলেন আলিবর্দ্দীর পক্ষে। তাই সরফ্‌রাজ যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। একে একে তাঁর ছোট-বড় অনেক সেনাপতিই কাৎ হইলেন। নবাব সরফ্‌রাজ বেগতিক দেখিয়া একটা বড় হাতীর পিঠে চড়িয়া নিজেই যুদ্ধে নামিলেন। তাঁহার কিন্তু নবাবি করার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল—বোঁ

করিয়া একটা গুলি আসিয়া তাঁহার মাথায় বিঁধিল—সেই গুলিতেই তাঁহার দফা শেষ হইল।

সরফ্‌রাজের সৈন্যের পিছন দিক রক্ষা করিবার ভার ছিল—রাজপুত-সেনাপতি বিজয় সিংহের উপর। নবাবের মৃত্যুর খবর যেমনি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল, অমনি তাঁহার দলের অনেকে গা-ঢাকা দিতে আরম্ভ করিল। বিজয় সিংহ রাজপুত—কাপুরুষের মত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইতে জানেন না। প্রাণের মায়া না করিয়া একটা ধারাল বল্লম-হাতে রুখিয়া চলিলেন আলিবর্দ্দীর দিকে। আলিবর্দ্দীর সৈন্যেরা অসাবধান ছিল না, বিজয় সিংহ তাহাদের শত শত অস্ত্রের লক্ষ্য হইলেন। দেখিতে দেখিতে একটি বন্দুকের গুলি খাইয়া তিনি ধুলায় লুটাইলেন।

বিজয় সিংহের এক ছেলে ছিল—নাম তার জালিম; বয়স বছর নয়। নিতান্ত ছেলেমানুষ, কিন্তু তবু বাপের ব্যাটা বটে! সে বাপের সঙ্গেই তলোয়ার-হাতে যুদ্ধে নামিয়াছিল। যখন দেখিল—শত্রুর গুলিতে বাপ নিহত হইয়াছেন, অমনি সে তলোয়ার উঁচাইয়া বাপের মৃতদেহের কাছে দাঁড়াইল আর সিংহ-শিশুর মত হুঙ্কার করিয়া বলিতে লাগিল, 'তফাৎ—তফাৎ! যে কাছে আস্‌বে, তাকেই যমালয়ে পাঠাবো।' বাপ যুদ্ধে মরিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি রাজপুত—হিন্দু; হিন্দুর মৃতদেহ হিন্দু-বই আর কাহাকেও ছুঁইতে নাই। পাছে-বা আর কেহ ছোঁয়—পায়ে মাড়ায়, এই ভয়ে বালক-

বীর জালিম মরিয়া হইয়া বাপের মৃতদেহের চারি দিক ঘুরিয়া তরবারি আস্ফালন করিতে লাগিল।

কিন্তু হাজার হোক, সে বালকমাত্র। আলিবর্দ্দীর বিজয়ী সৈন্যের চাপে পিষিয়া দলিয়া মরা তাহার পক্ষে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য ছিল না। কিন্তু তাহারা বালকের এই অদ্ভুত তেজ দেখিয়া একেবারে থমকিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল।

আলিবর্দ্দী নিজেও ছিলেন বীর, তিনি কি বীর বালকের কদর না করিয়া পারেন? বালকের এই অদ্ভুত সাহস, বীরত্ব আর পিতৃভক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। তখনই সৈন্যদের হুকুম দিলেন—'হিন্দু-বই আর কেউ যেন বিজয় সিংহের মৃতদেহ স্পর্শ না করে। আমার দলে যত সৈন্য আছে তারা সবাই যেন সমারোহ ক'রে বিজয় সিংহের দেহ গঙ্গাতীরে নিয়ে গিয়ে তার সৎকারের ব্যবস্থা করে।'

হুকুম শুনিয়া হিন্দু-সৈন্যেরা খুব খুশী হইয়াছিল, তাহারা আলিবর্দ্দীর নামে জয়ধ্বনি দিয়া মহা আনন্দে বিজয় সিংহের দেহ গঙ্গাতীরে লইয়া চলিল, আর বালককেও আদর করিয়া কাঁধে করিয়া লইতে ভুলিল না।

নয় বছরের ছেলে জালিমের অদ্ভুত সাহস ও পিতৃভক্তির কথা সোনার অক্ষরে আজও ইতিহাসে লেখা রহিযাছে। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে গিরিয়ার যুদ্ধ একটা মস্ত বড় ঘটনা, আর সেই ঘটনার একটা খুব বড় কথা এই জালিমের বীরত্ব।

যেখানে জালিম এই বীরত্ব দেখাইয়াছিল, লোকে এখনও সেখানটাকে বলে—জালিম সিংহের মাঠ।

জান কবুল

সে আজ চার-শো সাড়ে চার-শো বছর আগেকার কথা। বলিতে গেলে গোটা ভারতেই তখন মুসলমানদের শাসন। ছোটবড় অনেক রাজা এই ভারতের অনেক জায়গায় রাজত্ব করিতেন। নানা দেশের কত গুণী জ্ঞানী আসিয়া তাঁহাদের দরবার জাঁকাইয়া তুলিতেন। এই সকল লোকের বেশীর ভাগই আসিতেন পারস্য হইতে। পারস্য দেশ সত্য-সত্যই তখন বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানের খনি। আজ যাঁহার কথা তোমাদের শুনাইব, তিনি সেই পারস্য দেশেরই লোক—নাম তাঁহার মামুদ গাওয়ান্। গাওয়ানের মত বিশ্বাসী, বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক মন্ত্রী মুসলমানদের আমলে আর একজনও ছিলেন না।

মামুদ গাওয়ান্ বড় বংশের ছেলে; নানা কারণে তাঁহাকে দেশের মায়া কাটাইতে হয়। অনেক জায়গা ঘুরিয়া মামুদ শেষে দাক্ষিণাত্যের বাহ্‌মনী রাজাদের রাজধানী বিদরে উপস্থিত হইলেন। দাক্ষিণাত্যে তখন অনেক জ্ঞানী ও গুণীর বাস। যিনি যেমন লোক, তিনি তেম্‌নি লোকের সঙ্গই ভালবাসেন। ব্যবসা করা উদ্দেশ্য হইলেও, গাওয়ান্ নিজে

পণ্ডিত বলিয়া ঐ-সকল লোকের সঙ্গেও তাঁহার আলাপ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিছু দিন তিনি নানা স্থানের ভাল ভাল লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিলেন। বিদরে দিনকতক বেশ মনের সুখে বাস করিবার পর স্থির করিলেন, দিল্লী যাইবেন। হঠাৎ একদিন বাহ্মনী-রাজ্যের রাজা আলাউদ্দীন-বাহ্মনী তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গুণীর গুণ ফুলের বাসের মত চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে—কিছুতেই চাপা থাকে না। রাজা তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির কথা আগেই শুনিয়াছিলেন। এইবার তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া এত খুশী হইলেন যে, তাঁহাকে আর দিল্লী যাইতে দিলেন না—নিজের দরবারেই একটি চাকরি দিয়া রাখিলেন। ক্রমে যোগ্যতা দেখাইয়া মামুদ বড় বড় পদ পাইতে লাগিলেন। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার ছেলে হুমায়ূন, হুমায়ূনের পর তাঁহার ছেলে নিজামের রাজত্বকালেও মামুদ বেশ সুনামের সঙ্গেই চাকরি করেন।

নিজামের অকাল মৃত্যুর পর মহম্মদ-শা বাহ্মনী রাজা হইলেন। মহম্মদের বয়স তখন অল্প বলিয়া রাণী-মা রাজ্যের অনেক কাজই নিজে দেখিতেন। তিনি গুণের কদর জানিতেন, তাই পুরনো বিশ্বাসী কর্ম্মচারী মামুদকেই বড়মন্ত্রী করিয়া দিয়াছিলেন। মন্ত্রী তাঁহার ডানহাত; তাঁহার সহিত মন্ত্রণা না করিয়া রাণী-মা বড়-একটা কিছু করিতেন না। ধরিতে গেলে, মন্ত্রী মামুদই তখন রাজ্যের কর্ত্তা; রাজার দশ হাজার

ঘোড়সওয়ারের চালক। তাহা ছাড়া তাঁহার নিজেরই মোগল-সৈন্য দু-হাজার।

মন্ত্রীর খেতাব আগে 'গাওয়ান্' ছিল না; মন্ত্রী হইবার পর তাঁহার পদবী হয়—গাওয়ান্। তাঁহার আগেকার নাম—খাজা মামুদ। গাওয়ান্ পদবী তিনি কেমন করিয়া পান, তাহার একটি ভারি মজার গল্প আছে। মামুদ একদিন রাজা ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গের সঙ্গে একটা ফাঁকা জায়গায় বসিয়া গল্প করিতেছেন; এমন সময় একটা গরু তাঁহাদের কাছে আসিয়া হাম্বা করিয়া ডাকিয়া উঠিল। রাজার একজন পেয়ারের লোক মামুদকে ঠকাইবার জন্য বলিল, "গরুটা যেন কি বল্‌তে এসেছে! আমাদের মন্ত্রী-মশাই তো খুব পণ্ডিত লোক, তিনি অবশ্যই ওর কথা বুঝতে পারছেন; গরুর কথা আমাদের বুঝিয়ে বলুন না।"

গরুর কথা গরুতেই বোঝে, মামুদ বুঝিলেন লোকটা তাঁহাকে গরু বলিয়া ঠাট্টা করিতেছে। কিন্তু মামুদ ঠকিবার পাত্র নন, চট্‌পট্ জবাব দিলেন, "গরুটা বল্‌ছে—মামুদ, আমি তোমার জাত-ভাই, তাই তোমায় সাবধান ক'রে দিচ্ছি, ভিন্ জাতের যে-সব গাধা এখানে আছে, তাদের সঙ্গে তুমি কখনও মিশতে যেও না।"

যেমন কথা, তার তেম্‌নি জবাব! লোকটার থোঁতা মুখ একেবারে ভোঁতা হইয়া গেল। মামুদ তাহাকে গাধা বানাইয়া তবে ছাড়িলেন। জবাব শুনিয়া রাজা হো হো করিয়া হাসিয়া

উঠিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার নাম হঁইল—'গাওয়ান্' কি-না, গরুর কথার সমঝদার।

রাজা মহম্মদ-শার একটা মস্ত বাতিক ছিল—দেশ জয় করা। আগেকার রাজাদের আমলে বাহ্মনী-রাজ্য তেমন বড় ছিল না। মহম্মদ-শা সিংহাসনে বসিয়াই রাজ্যের এলাকা বাড়াইবার মতলব করিলেন। গাওয়ান্ যে শুধু বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী—বসিয়া বসিয়া রাজাকে মন্ত্রণা দিয়াই খালাস, তাহা নয়। তিনি মন্ত্রণাও দিতেন, আবার দরকার হইলে তলোয়ার লইয়া যুদ্ধেও নামিতেন।

বাহ্মনী-রাজ্যের আশপাশে তখন হিন্দুদের অনেক রাজ্য ছিল। গাওয়ান্ তাহার অনেকগুলি জয় করিয়া রাজ্যের এলাকা বাড়াইয়া দিলেন। গোয়া-দ্বীপ তখন বাণিজ্যের বিখ্যাত বন্দর; হিন্দুরা ইহার মালিক। মহম্মদ-শার বড় ইচ্ছা, দ্বীপটা তাঁহার হাতে আসে। হিন্দুরা তাঁহার মতলব বুঝিবার আগেই গাওয়ান্ সৈন্যসামন্ত লইয়া ঐখানে গিয়া হাজির হইলেন, আর হিন্দুদের হাত হইতে জায়গাটা কাড়িয়া লইলেন।

রাজধানীতে বসিয়া রাজা যখন এই সুখবর পাইলেন, তখন প্রাণে তাঁর আনন্দ আর ধরে না। হুকুম দিলেন, 'বাজাও নহবৎ—এক-আধ দিন নয়—ক্রমাগত সাত দিন সাত রাত! আর চালাও—নাচগান, খানাপিনা হরদম্!'

রাজা বলিলেন, “এর মধ্যে তোমার ভয় করবার কি আছে ? যা আছে, তার খবর আমি জানতে চাই—তুমি নির্ভয়ে বল ।”

তবিলদার বলিল, “খোদাবন্দ ! তবে শুনুন বলি, মন্ত্রী-সাহেবের দুই তবিল। এক তবিলকে তিনি বলতেন—রাজভাণ্ডার, আর একটি তবিলকে বলতেন—গরিব-ভাণ্ডার। রাজভাণ্ডারে আছে আঠারো হাজার টাকা, আর গরিব-ভাণ্ডারে আড়াই-শো।”

রাজা আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, “মোটে আঠারো হাজার আড়াই-শো !”

তবিলদার বলিল, “হাঁ খোদাবন্দ, মোটে আঠারো হাজার আড়াই-শো টাকাই তাঁর তবিলে জমা আছে। তার বেশী যদি এক পয়সাও পান, আমার গর্দ্দান নেবেন। বেশী টাকা তবিলে কেমন ক'রে থাকবে ? ঐ যে রাজভাণ্ডারের কথা বললুম, তাতে জমা হ'ত জায়গীরের টাকা। তা থেকে সৈন্যসামন্তদের মাইনে, হাতীশালের হাতী আর ঘোড়াশালের ঘোড়ার খরচ দেওয়া হ'ত। দিয়ে-থুয়ে যা থাকত, তা তিনি গরিব-দুঃখীদের খয়রাৎ করতেন, নিজের জন্যে একটি কাণাকড়িও রাখতেন না। দেশ থেকে যখন তিনি আসেন, হাজার-তিরিশেক টাকা সঙ্গে ছিল। এই টাকাটা কারবারে খাটতো। যা লাভ হ'ত, তাই জমতো এই গরিব-ভাণ্ডারে এই গরিব-ভাণ্ডার থেকে মাঝে মাঝে দেশের আত্মীয়স্বজন

আর বন্ধুবান্ধবদের খরচ দিতেন। এত বড় যে নামডাকের মন্ত্রী—গাওয়ান্, নিজের সাজ-পোশাক আর সংসার-খরচের জন্যে এই তবিল থেকে রোজ কত টাকা নিতেন জানেন ?—মোটে দেড়টি ক'রে টাকা। শুতেন তিনি মাদুরে, খানা তৈরি হ'ত মাটির হাঁড়িতে! বাইরে ছিলেন মন্ত্রী, ঘরে ছিলেন মহাসাধু—ফকির! এই ফকিরের ঘরে আপনি লাখ-লাখ টাকা পাবার আশা করেন খোদাবন্দ! আরও একটি কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করবো, গোস্তাকি মাপ করবেন। যে মহাসাধু, মহাবীর মন্ত্রী রাজ্যের জন্যে এত করলেন, হাসতে হাসতে তলোয়ারের নীচে মাথা পেতে দিলেন, তাঁর প্রাণ নেবার আগে একবার ভেবে দেখেছিলেন কি, তাঁর পক্ষে রাজ্যটা আর একজনের হাতে তুলে দিতে যাওয়া সম্ভব কি-না? যে-চিঠির কথায় বিশ্বাস ক'রে তাঁর প্রাণদণ্ড দিলেন, দণ্ড দেবার আগে খোঁজ নিয়ে দেখেছিলেন কি, সে চিঠি কে নিয়ে যাচ্ছিল উড়িষ্যার রাজার কাছে? আর সে চিঠি মন্ত্রী লিখেছিলেন, না, আর কেউ তাঁর নাম জাল ক'রে লিখেছিল ?"

কথা শুনিয়া রাজার নেশা ছুটিয়া গেল। ভাবিলেন, তাই তো, আমি কি করিয়াছি! লোকের কথায় ভুলিয়া কিছুই তো তলাইয়া দেখি নাই! তবে কি সত্য-সত্যই আমি বিনা-দোষে মহাসাধুর শির লইলাম!

তখনই তলব হইল সেই-সব লোকদের—যাহারা চিঠি আনিয়া তাঁহাকে দেখাইয়াছিল।

রাজা হুকুম করিলেন, "আমি জানতে চাই কে নিয়ে যাচ্ছিল মন্ত্রীর চিঠি! হাজির করো তাকে এখনই আমার সাম্‌নে, নইলে সবাইকে আমি কোতোল করবো—এক্ষনি—এই দণ্ডে।"

শয়তানদের মুখ চুন হইয়া গেল। রাজা এবার আর মদ খাইয়া সিংহাসনে বসেন নাই, হুঁশিয়ার হইয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন। তাঁর চুলচেরা বিচারে দোষীদের দোষ ধরা পড়িল। সকলের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হইল। দোষীর তো সাজা হইল, কিন্তু যার দোষ নাই—যে প্রাণ দিয়া রাজ্যের সেবা করিয়াছে—তাহাকে তো আর ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই! 'কি করেছি আমি, হায়, কি করেছি!'—এই হইল তাঁর বুলি। আর ওদিকে রাজ্যের যাহারা শত্রু, তাহাদের দাপট দেখে কে! এত দিন তাহারা মন্ত্রীর ভয়ে অস্থির ছিল। এইবার রাজাকে অসহায় দেখিয়া 'হারে রে রে' করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া রাজ্যে আগুন লাগাইয়া দিল।

বিনা-দোষে সাধুর প্রাণদণ্ড!—এত বড় অন্যায় কি বিধাতার প্রাণে সয়! তাঁর রাগ নানা রকমে নানা দিকে ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

মনের জ্বালা জুড়াইবার জন্য রাজা আরও বেশী করিয়া মদ খাইতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার দেহ ভাঙিয়া

পড়িল, আহার গেল, রাত্রের ঘুমও দূর হইল। তিনি শুধু দেখিতে লাগিলেন, মন্ত্রীর কাটামুণ্ড আর সেই তলোয়ার—যে-তলোয়ার দিয়া মামুদের গর্দ্দান লওয়া হইয়াছিল। 'খুন! খুন! খুন করলে! ঐ যে মুণ্ডকাটা মামুদের হাতে রক্তমাখা তলোয়ার!'—এই বলিতে বলিতেই একদিন তাঁহার সব শেষ হইল। সাধু-হত্যার প্রতিফল রাজা হাতে-হাতেই পাইলেন।

